উপকারী বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া প্রয়োগে বেগুন চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল-২০২১

উপকারী নভেল বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা উৎপাদিত জৈব পণ্য ব্যবহার করে বেগুনের ঢলে পড়া রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার কর্মসূচি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম-৪৩৩০

Vision/Dream for Bio-Center in Bangladesh

Manufacturing Process of EMO

Medium Preparation & Sterilization → Seed Inoculation

↓

Cultivation in Fermentor (28°C, 3 days) → Concentration ($1x10^{11}$ cfu/g)

↓

Formulation → Packing

"উপকারী বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া প্রয়োগে বেগুন চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল-২০২১"

সম্পাদনায়
ড. মুহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন
ড. মো. খলিলুর রহমান ভূঁইয়া

সার্বিক সহযোগিতায়
ড. মো. খলিলুর রহমান ভূঁইয়া

অর্থায়নে
কৃষি মন্ত্রণালয়

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম-৪৩৩০

প্রকাশকাল
মার্চ-২০২১

মুদ্রণ সংখ্যা
১০০০ (এক হাজার) কপি

সত্ব-সংরক্ষিত
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম-৪৩৩০

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ
ড. মুহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন
কর্মসূচি পরিচালক
০১৭১১৪৮৮৭৩৩, ০১৮৭৩৪৮৮৭৩৩
E.mail: thronybari@gmail.com

মুদ্রণে
ফারুক কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
মোহনা-ম্যানশন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
মোবাইলঃ ০১৮৭৯৪৫৯৪৩৮
E.mail: farukpublication@gmail.com

Correct Citation: Hossain, M. T. and Bhuiyan, M. K. R. (Eds.). 2021. *Upokari Bacillus Bacteria Proyoge Begun Chash Babosthapona Bishayok Prosikkhon Manual-2021,* Regional Agricultural Research Station, Hathazari, Chattogram.

Inception Workshop (26-09-2019)

ড. মো. আব্দুল ওহাব, মহাপরিচালক, বিএআরআই মহোদয় কর্মসূচির কৃষক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন (১৪ ফেব্রুয়ারী ২০২০)।

ড. মো. নাজিরুল ইসলাম, মহাপরিচালক, বিএআরআই মহোদয় এর সাথে কর্মসূচির বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি-২০২০-২১ স্বাক্ষর।

Monitored by the Evaluation Team of BARI

ড. মো. সাবজাল উদ্দিন, সাবেক মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, অঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন।

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাণী

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি-কৃষকের উন্নয়নের উপরই নির্ভর করে এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের কৃষি আজ অনেকাংশেই হুমকির মুখে পড়েছে। শুধুমাত্র রোগের কারণেই প্রতি বছর শতকরা ১০-৩০ ভাগ ফসল বিনষ্ট হয়; ক্ষেত্রবিশেষে এর পরিমাণ আরও বেশি। এই ক্ষতির প্রভাব থেকে দেশকে রক্ষা করতে ফসল উৎপাদনে জৈব বালাই নাশক এর মতো পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

কৃষিতে উপকারী নভেল বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়ার প্রয়োগ এমনই একটি পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি যা দিয়ে সহজেই বেগুনের ঢলে পড়া রোগ দমন করা হয়। এই প্রযুক্তির উপকারী জীবাণু ও অণুজীব ব্যবহার করে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন কার্যক্রমকে আরো সুসংহত করবে। এর মাধ্যমে প্রযুক্তি ব্যবহারে জমির ভৌত গুণাগুন বৃদ্ধিসহ মাটির উপকারী জীবাণুর সঞ্চালন হবে এবং রোগমুক্ত কৃষি পণ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে বলেও আমি আশাবাদি।
এই প্রযুক্তির উপর তৈরী **"উপকারী বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া প্রয়োগে বেগুন চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল-২০২১"** প্রকাশনাটি এই সময়ের দাবি। প্রকাশনার সাথে জড়িত বিজ্ঞানী ও সংশ্লিষ্টদের জানাই অভিনন্দন ।

(ড. মো. নাজিরুল ইসলাম)

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

বাণী

কৃষিই সকল কৃষ্টির মূল, সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। কৃষির উন্নতিই দেশের উন্নতি। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট সেই লক্ষ্যেই বিভিন্ন ফসলের নানামুখী বিষয় নিয়ে গবেষণা করে আসছে। আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম উদ্ভিদের ব্যাক্টেরিয়াজনিত রোগ জীবাণু প্রতিরোধকল্পে উপকারী নভেল বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা উৎপাদিত জৈব পণ্য ব্যবহার করে বেগুনের ঢলে পড়া রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। কর্মসূচির আওতায় **"উপকারী বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া প্রয়োগে বেগুন চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল-২০২১"** পুস্তকটি প্রকাশ করতে পারায় আমি আনন্দিত। কৃষিতে উপকারী নভেল বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়ার প্রয়োগ একটি আলোচিত বিষয় যা সময়ের দাবি বলে মনে করছি। কৃষি পণ্যকে বিষমুক্ত রাখতে উক্ত বিষয়ের উপর আরো জোরালো গবেষণা করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। উপকারী নভেল বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়ার ফলপ্রসূ প্রয়োগে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আরো নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আমার বিশ্বাস। কৃষি বান্ধব উপকারী নভেল বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা উৎপাদিত জৈব পণ্য ব্যবহার করে বেগুনের ঢলে পড়া রোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি বিশেষ করে বেগুন উৎপাদনে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ায় কৃষি মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গবেষণা প্রকাশনাটি বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের জ্ঞানভান্ডার আরো সমৃদ্ধ করবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি। নয়া এই গবেষণাটি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মহোদয়কে সহযোগিতা প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতাবশে শ্রদ্ধার ফুলঝুড়ি জ্ঞাপন করছি।

আমি প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

ড. মো. খলিলুর রহমান ভূঁইয়া

মুখবন্ধ

উন্নয়নের সকল দ্যুতি কৃষির হাতছোঁয়া দিয়েই অগ্রায়িত হয়ে আসছে। গবেষণার কারণে কৃষির ব্যবস্থাপনা আরো মজবুত এবং ফলপ্রসূ অর্থবহ হয়ে উঠছে প্রতিনিয়ত। বর্ণীল ঐতিহ্যের অধিকারী বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট সেই লক্ষ্যেই বিভিন্ন ফসলের নানামুখী বিষয়ের উপর মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা করে আসছে। আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম এবার নতুনভাবে উদ্ভিদের ব্যাক্টেরিয়াজনিত রোগ জীবাণু প্রতিরোধকল্পে উপকারী নভেল বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা উৎপাদিত জৈব পণ্য ব্যবহার করে বেগুনের ঢলে পড়া রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে পরিচালিত কর্মসূচিটি কৃষি ব্যবস্থাকে ভেজালমুক্ত এবং রোগমুক্ত রাখতে একটি ফলপ্রসূ প্রয়াস বয়ে আনবে "ইনশাল্লাহ"-যা আমি মনে-প্রাণে দৃঢ়তার সাথে লালন করি।

"উপকারী বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া প্রয়োগে বেগুন চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল-২০২১" প্রকাশনটি বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণকর্মী ও কৃষকের উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণায় পাথেয় হয়ে থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আর্থিক অনুদানের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় বিশেষ করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মহোদয়কে কৃতজ্ঞতাবশে শ্রদ্ধার্ঘ্য সম্ভাষণ জ্ঞাপন করছি।

প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

ড. মুহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন
কর্মসূচি পরিচালক
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

উপকারী বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া প্রয়োগে বেগুন চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল-২০২১

উপকারী নভেল বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা উৎপাদিত জৈব পণ্য ব্যবহার করে বেগুনের ঢলে পড়া রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার কর্মসূচি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম-৪৩৩০

"উপকারী বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া প্রয়োগে বেগুন চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল-২০২১"

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয় বস্তু	পৃষ্ঠা নং
০১	কৃষিতে উপকারী নভেল বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়ার প্রয়োগ ও ব্যবহার ড. মুহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও কর্মসূচি পরিচালক	৮-১৬
০২	ফসলের রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশকের ক্রমবর্ধমান ইতিহাস ড. মো. ইকবাল ফারুক, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১৭-২১
০৩	বেগুনের চারা উৎপাদন প্রযুক্তি মো. আব্দুল্লাহ আল মালেক, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	২২-২৬
০৪	বেগুন চাষের উৎপাদন প্রযুক্তি ড. মো. মোক্তাদির আলম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	২৭-৩০
০৫	বেগুনের জাত পরিচিতি ড. এস. এম. ফয়সল, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৩১-৩২
০৬	বেগুনের ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী জাত উন্নয়ন প্রযুক্তি মো. গোলাম আজম, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৩৩-৩৫
০৭	কৃষিতে মলিকুলার প্রযুক্তির প্রয়োগ ড. মো. ইমরান খান চৌধুরী, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৩৬
০৮	বেগুনের প্রধান প্রধান রোগ এবং তার সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা এস এম কামরুল হাসান চৌধুরী, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৩৭-৪০
০৯	বেগুনের ঢলে পড়া রোগ ও তার দমন ব্যবস্থাপনা ড. মো. মনিরুল ইসলাম, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৪১-৪২
১০	ঢলে পড়া রোগ নিয়ন্ত্রণে বেগুন চাষে সেচ ব্যবস্থাপনা মো. পানজারুল হক, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৪৩-৪৮
১১	বেগুনের পুষ্টিমান ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে বেগুন চাষের বর্তমান অবস্থা ড. মো. খলিলুর রহমান ভুইয়া	৪৯-৫০
১২	বেগুনের পুষ্টি ও ঔষধি গুণাগুন মো. মনিরুজ্জামান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৫১-৫২

কৃষিতে উপকারী নভেল বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়ার প্রয়োগ ও ব্যবহার

ড. মুহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও কর্মসূচি পরিচালক
(উপকারী নভেল বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা উৎপাদিত জৈব পণ্য ব্যবহার করে বেগুনের ঢলে পড়া রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার কর্মসূচি

Innovation and dissemination of formulated bio-product from novel endophytic *Bacillus* species for controlling wilting of eggplant)

ব্যাক্টেরিয়া কি ?

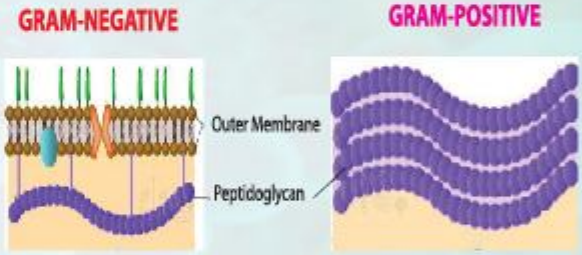

ব্যাক্টেরিয়া (ইংরেজি ঃ Bacteria একবচন ঃ bacterium) হলো এক প্রকারের আদি নিউক্লিয়াসযুক্ত, অসবুজ, এককোষী অণুজীব। এরা হলো প্রোক্যারিয়ট (প্রাক-কেন্দ্রিক)। ব্যাক্টেরিয়া আণুবীক্ষণিক জীব। বিজ্ঞানী অ্যান্টনি ভ্যান লিউয়েন হুক সর্বপ্রথম ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে বৃষ্টির পানির মধ্যে নিজের তৈরি সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে ব্যাক্টেরিয়া পর্যবেক্ষণ করেন। ব্যাক্টেরিয়া হলো এক প্রকারের এককোষী অণুজীব যাদের কোষে দ্বিস্তর ঝিল্লি (প্রাচীর বা পর্দা বা সূ-আবরণ) বা অন্য কোন প্রকার ঝিল্লি দ্বারা আবৃত কোনো অঙ্গাণু থাকে না। এদের কোষে এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা, প্লাস্টিড ও মাইটোকন্ড্রিয়া নেই, তবে রাইবোজোম রয়েছে। এদের হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস থাকে যা সুসংগঠিত নয়। এরা প্রোক্যারিওটিক বা কেন্দ্রিক যার কোষ হচ্ছে এক কক্ষ বিশিষ্ট ঘরের মত, ঝিল্লিবিহীন নিউক্লিয়েড রয়েছে, রৈখিক ক্রোমোজোম নেই, বৃত্তাকার ডিএনএ রয়েছে, সাইটোকঙ্কাল নেই। কোষের চারদিকে ফ্লাজেলা নামে ক্ষুদ্র সুতার মতো বর্ধিত অংশ এবং কোষের পৃষ্ঠদেশে আমিষ নির্মিত কিছু সংখ্যক চুলের মতো উপাঙ্গ দেখা যায়; যাদেরকে পিলি বলা হয়। এগুলো পোশক দেহের সঙ্গে নিজেকে আটকে রাখতে সাহায্য করে। পরবর্তীতে এগুলো আন্দোলিত করে তাদের স্থান পরিবর্তন করে থাকে। ব্যাক্টেরিয়া আবার দুই ধরনের হয়ে থাকেঃ- গ্রাম পজিটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ ব্যাক্টেরিয়া। গ্রাম পজিটিভ ব্যাক্টেরিয়াগুলো বেশী আদিম, ঝিল্লির আবরণ একটি যেখানে পুরু পেপ্টাইডোগ্লাইকেন এর আস্তরণ রয়েছে। অপরদিকে গ্রাম নেগেটিভ ব্যাক্টেরিয়ার ঝিল্লির আবরণ দুটি যার মাঝখানে পাতলা পেপ্টাইডোগ্লাইকেন এর আস্তরণ রয়েছে।

আদিকোষী অণুজীবদের একটি বিরাট অধিজগৎ ব্যাক্টেরিয়া নিয়ে গঠিত। সাধারণত এরা দৈর্ঘ্যে কয়েক মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। ব্যাক্টেরিয়ার বিভিন্ন ধরনের আকৃতি রয়েছে; যেমন: গোলাকৃতি থেকে দন্ডাকৃতি ও সর্পিলাকার। গোড়ার দিকে পৃথিবীতে যেসব রূপে প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছিল, ব্যাক্টেরিয়া তাদের মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীর অধিকাংশ আবাসস্থলেই ব্যাক্টেরিয়া বিদ্যমান রয়েছে। ব্যাক্টেরিয়া মাটি, জল,আম্লিক, উষ্ণ, ঝরনা, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ভূত্বকের গভীর জীবমন্ডলে বাস করে। ব্যাক্টেরিয়া উদ্ভিদ ও প্রাণীর সাথে মিথোজীবী ও পরজীবী সংস্পর্শে বাস করে থাকে। বেশিরভাগ ব্যাক্টেরিয়া চিহ্নিত হয়নি এবং মাত্র প্রায় ২৭ শতাংশ ব্যাক্টেরিয়া পর্বের প্রজাতিগুলোকে গবেষণাগারে আবাদ (Culture) করা যায়। সচরাচর এক গ্রাম মাটিতে প্রায় ৪ কোটি (৪০ মিলিয়ন) ব্যাক্টেরিয়া এবং ১ মিলিলিটার মিঠা জলে দশ লাখ (এক মিলিয়ন) ব্যাক্টেরিয়া থাকে।

প্রোবায়োটিক বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া কি?

জীবিত অণুজীব পোষকের (প্রাণী/ উদ্ভিদ/ অন্য জীব) দেহে ও পরিবেশে উপস্থিত থেকে পোষককে ক্ষতিকর রোগ-জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয় ও পোষকের দৈহিক বৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে সেসব উপকারী অণুজীবকেই প্রোবায়োটিক বলা হয়। সহজ কথায় প্রোবায়োটিক হচ্ছে উপকারী/বন্ধু অণুজীব (প্রধানতঃ ব্যাক্টেরিয়া জাতীয়) যাদের উপস্থিতিতে ক্ষতিকর অণুজীব দমন করা যায় বা এদের ক্ষতি করার ক্ষমতা কমানো যায়। ফলে চাষযোগ্য ফসলকে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি হতে বাঁচিয়ে এবং পরিবেশ বান্ধব চাষ ব্যবস্থাপনার আওতায় ফসলের সার্বিক উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়। আজকাল বিভিন্ন গৃহপালিত প্রাণী এমনকি মানুষকেও নির্ধারিত প্রোবায়োটিক খাওয়ানো হচ্ছে তাদের পেটের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য। এতে করে পেটের ভেতরের ক্ষতিকর অণুজীবের সংখ্যা কমে যায়, উপকারী অণুজীবের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং ক্ষতিকর অণুজীবের ক্ষতি করার ক্ষমতা অনেকাংশেই কমে যাওয়ায় সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা যায়। আমাদের দেশে উদ্ভিদের জন্য বেসিলাস প্রোবায়োটিক ব্যাক্টেরিয়ার প্রয়োগ সবে মাত্র শুরু হয়েছে যার ফলে গাছে বা ফসলে ক্ষতিকর জীবাণুর পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়; ফলে তাদের কার্যকারীতা কমে যায়। আবার উপকারী অণুজীবগুলো গাছের প্রতিরোধ (Resistance) ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। এই জন্য প্রোবায়োটিক বেসিলাস কৃষির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কেন প্রোবায়োটিক ব্যবহার করব ?

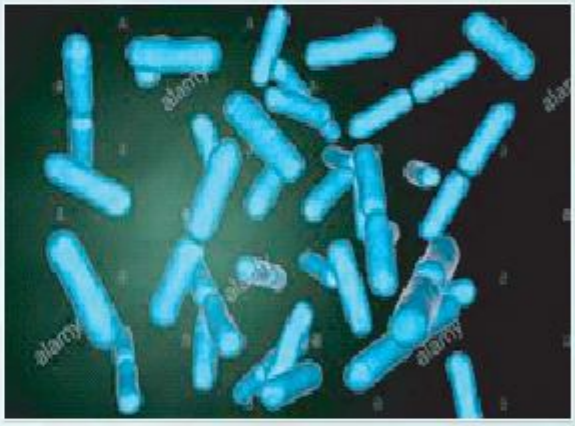

রোগবালাই সৃষ্টিকারী অপকারী অণুজীব সমূহকে নিয়ন্ত্রণে যুগ যুগ ধরে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু এন্টিবায়োটিকের মাধ্যমে ক্ষতিকর জীবাণু মেরে ফেলা গেলেও একইসাথে জীবদেহে ও পরিবেশে বিদ্যমান নানান উপকারী অণুজীবেরও ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এন্টিবায়োটিকের অপরিমিত ও অবাধ প্রয়োগের ফলে ক্ষতিকর জীবাণুর নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা (Resistance power) তৈরি হয়। ফলে একসময় এন্টিবায়োটিকের মাধ্যমে ক্ষতিকর জীবাণু আর দমন করা যায় না। তাছাড়া এন্টিবায়োটিক প্রয়োগে তাৎক্ষণিক সমাধান হলেও দীর্ঘমেয়াদে তা মানবদেহে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এজন্যই রোগ দমনে এন্টিবায়োটিকের বিকল্প হিসেবে প্রোবায়োটিকের ব্যবহার অধিক যৌক্তিক এবং স্থায়ী বলে বিবেচিত হচ্ছে।

প্রোবায়োটিক ব্যাক্টেরিয়া কি উপকার করে?

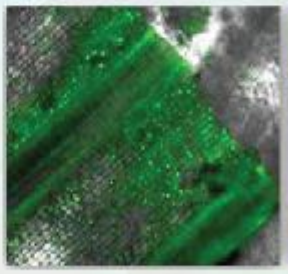

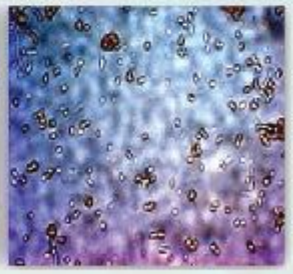

* প্রোবায়োটিক জীবদেহে ও পরিবেশে উপস্থিত থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে
* ক্ষতিকর জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধ করে
* ক্ষতিকর জীবাণুরোধী বস্তু (ব্যাক্টেরিওসিন) নিঃসৃত করে
* বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান ও ভিটামিন উৎপাদনে সহায়তা করে
* রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
* ক্ষতিকর জীবাণুর অতিরিক্ত বংশবৃদ্ধি প্রতিরোধে জৈবিক নিয়ন্ত্রক এজেন্ট হিসেবে কাজ করে
* পোষকদেহের নানামুখী ক্ষতিকর অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে
* পরিবেশের মাটি ও পানির উন্নয়ন ঘটায়
* ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান নিষ্ক্রীয় করে

প্রোবায়োটিক কিভাবে কাজ করে?

উদ্ভিদ বা জীবদেহে প্রোবায়োটিক ঠিক কিভাবে কাজ করে সে বিষয়ে বিগত কয়েক দশকে গবেষকগণ তাঁদের গবেষণার ভিত্তিতে নানা তথ্য দিয়েছেন। প্রোবায়োটিকের কাজের ক্ষেত্রে বর্ণিত উপায় ও পদ্ধতিগুলি খুব সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হল ঃ

অন্ত্রের অভ্যন্তরভাগে উপকারী প্রোবায়োটিক অণুজীব বংশবিস্তার করে অন্ত্র বরাবর অবস্থান গ্রহণ করায় (Colonization) ক্ষতিকর জীবাণু অন্ত্রে সংযুক্ত হতে পারে না। এর ফলে ক্ষতিকর জীবাণুগুলো নিষ্ক্রিয় হতে বাধ্য হয়। এটি ক্ষতিকর জীবাণুসমূহের বাসস্থানগত প্রতিযোগিতামূলক দমন বা দূরীকরণ (competitive exclusion of pathogenic bacteria/microbes) পদ্ধতি হিসেবে বেশ আলোচিত। পর্যাপ্ত সংখ্যক উপকারী প্রোবায়োটিক অণুজীব জীবদেহ ও পরিবেশে থাকলে তারা স্বভাবতই প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানসমূহ প্রাপ্তির প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হয়ে থাকে। পুষ্টি উপাদানসমূহ প্রাপ্তিতে এহেন প্রতিযোগিতাপূর্ণ অবস্থানে ক্ষতিকর অণুজীবের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও তারা টিকে থাকতে পারে না। কিছু প্রোবায়োটিক উদ্বায়ী ফ্যাটি এসিড ও ক্ষতিকর জীবাণুরোধী বস্তু (antibacterial compounds) তৈরি করায় ক্ষতিকর অণুজীবের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। কিছু প্রোবায়োটিক অণুজীব বিপাকীয় উৎসেচক (যেমন-প্রোটিয়েজ, লাইপেজ, এমাইলেজ ইত্যাদি) নিঃসরণ ঘটিয়ে পোষকের বিপাক প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। বিপাকের মাধ্যমে উৎপাদিত দরকারি এমাইনো এসিড, ফ্যাটি এসিড, ভিটামিন ইত্যাদি জৈব পুষ্টি উপাদান পোষক কর্তৃক সরাসরি পরিশোধিত হওয়ায় পোষকের বৃদ্ধি তরান্বিত হয়। এভাবে প্রোবায়োটিক ব্যাক্টেরিয়া উদ্ভিদ ও প্রাণীদের উপকার করে থাকে।

আবার মাটি ও পানির গুণগত মান উন্নয়ন, পিএইচ নিয়ন্ত্রণ, বর্জ্য শোধন, ক্ষতিকর এমোনিয়া ও নাইট্রাইট দূর করা ইত্যাদির জন্য প্রোবায়োটিক হিসেবে বেসিলাস (*Bacillus* sp.) গণের ব্যাক্টেরিয়ার ব্যবহার বেশ প্রসিদ্ধ। কিছু ফটোট্রপিক ব্যাক্টেরিয়া সূর্যের আলো কাজে লাগিয়ে দ্রুত কাংক্ষিত প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে ভূমিকা রাখে। কিছু কিছু প্রোবায়োটিক খাদ্যের সাথে জীবদেহে প্রবেশ করলে তা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে (immune system) উদ্দীপ্ত করে; প্রতিরোধমূলক শ্বেত রক্ত কণিকার (leucocytes) ফ্যাগোসাইটিক ক্রিয়া বাড়িয়ে দেয়; ফলে জীবাণুনাশ ও রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধে সহজ হয়। তাছাড়াও ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে প্রোবায়োটিকের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা অদ্যবধি চলমান রয়েছে। প্রোবায়োটিকের ব্যবহারের জন্য গাছ পালায় বিভিন্ন হরমোন-সেলিসাইলিক এসিড, জেসমনিক এসিড, এবসেসিক এসিড উদগীরণ হয়।

প্রোবায়োটিক কেন নিয়মিত প্রয়োগ করতে হয়?

বলা হয়ে থাকে রোগ হওয়ার পর চিকিৎসা করা অপেক্ষা রোগ প্রতিরোধ সর্বদাই উত্তম। সকল জীবে উপকারী এবং অপকারী উভয় প্রকার অণুজীব বিদ্যমান। সুযোগ সন্ধানী ক্ষতিকর অপকারী অণুজীবগুলো সুযোগ পেলেই পোষক কোষে রোগ তৈরি করে, ফলে দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, এমনকি মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। অপরদিকে, প্রোবায়োটিক জীবদেহের বিভিন্ন জৈবিক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই যেকোন পোষক বিশেষ করে উদ্ভিদে পর্যাপ্ত পরিমাণ উপকারী অণুজীব বা প্রোবায়োটিকের সংখ্যা বজায় রাখা খুবই জরুরি। কিন্তু অনেক সময় নানা কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক কারণে যেমন-এ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ বা এর বাহ্যিক ব্যবহার, নানাবিধ পীড়ন ও ধকল, বাসস্থান ও খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ইত্যাদির কারণে উপকারী অণুজীবের সংখ্যা কমে যেতে পারে। পরিবেশে উপকারী এবং অপকারী অণুজীবের ভারসাম্যহীনতা দেখা দিলেই পরিবেশ দূষিত হয়, উপকারী অণুজীবের বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ বিনষ্ট হয়, চাষযোগ্য প্রজাতিতে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমশঃ আরও নানা সমস্যা তৈরি হতে থাকে। তাই কেবল দূষিত পরিবেশে বা রোগাক্রান্ত অবস্থার জন্য নয় বরং সুস্থ ও স্বাভাবিক চাষাবাদে নিয়মিত প্রোবায়োটিক ব্যবহার করা উচিত।

কৃষিতে বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়ার ইতিহাস

ব্যাক্টেরিয়ার কথা শুনলেই আগে মানুষ ভয় পেত। এখন আর ভয় পায় না কারণ বেশির ভাগ গ্রাম পজিটিভ বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়াই মানব কল্যাণে ব্যবহার হচ্ছে। কৃষিতে নভেল বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়ার ব্যবহার বহু আগে থেকেই হয়ে আসছে। আমাদের দেশেও এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। সাধারনত মাটির ভৌত অবস্থার উন্নয়ন, পোকা-মাকড়-রোগ-বালাই দমন, বিষমুক্ত কৃষি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নভেল প্রজাতির উপকারী জীবাণুর অনুসন্ধান ও তা ব্যবহারের মাধ্যমে লাগসই-টেকসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন করা আজ আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উক্ত প্রযুক্তিসমূহ কৃষকের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে হবে। ইতোমধ্যেই বিশ্বের বহুদেশ এমনকি আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতও আজ বেসিলাস (Bacillus) ব্যাক্টেরিয়া থেকে উৎপাদিত জৈব পণ্য (Formulated Product) কৃষিতে ব্যবহার করছে। জার্মান বিজ্ঞানী ফারদিনান্ড কন (Ferdinand Cohn) ১৮৭২ সালে প্রথম আধুনিক বেসিলাস (*Bacillus* sp.) এর নামকরণ করেন। তারপর বহু গবেষণার পর ১৯৩১ সালে সেনফোর্ড এবং ব্রডফোট (Sanford and Broadfoot) আধুনিক বায়োকন্ট্রোল বিষয় নিয়ে অবহিত করেন। পরবর্তীতে ১৯৩৩ সালে চেষ্টার (Chester) "অর্জিত শারীরবৃত্তিয় প্রতিরোধ ক্ষমতা" (Acquired Physiological Immunity) নিয়ে প্রথম অবগত করেন এবং তাঁদের গবেষণার ধারাবাহিকতায় ১৯৬১ সালে জার্মান বিজ্ঞানী ফ্রাংক রস (Frank Ross) "পদ্ধতিগত অর্জিত প্রতিরোধ ক্ষমতা" (Systemic Acquired Resistance) নিয়ে প্রথম গবেষণা ফলাফল প্রকাশ করেন। অন্যদিকে, নেদারল্যান্ড বিজ্ঞানী ভ্যান লোন (Van Loon) ১৯৮২ সালে উদ্ভিদের জীবাণু প্রতিরোধী জীন (Pathogenesis Related Gene/Protein) প্রথম উদ্ভিদ কোষে আবিষ্কার করেন। তারপর থেকেই উদ্ভিদ-জীবাণুর নানামুখী সমীকরণ (Plant-Microbe Interaction) নিয়ে হৈচৈ পড়ে যায় বিজ্ঞানমনস্ক মানবকুলে। ৮০'র দশক থেকে ৯০'র দশক সময় গুলোতে ব্যাক্টেরিয়ার সহায়তায় গাছের বৃদ্ধি, PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria), আন্তঃকোষীয় উপকারী বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া (Endophytic Bacillus Bacteria) নিয়ে তোড়জোড় শুরু হয়। পরে নেদারল্যান্ড বিজ্ঞানী ভ্যান পিয়ার (Van Peer) ১৯৯২ সালে "প্রবর্তিত প্রতিরোধ ক্ষমতা" ISR (Induced Systemic Resistance) নিয়ে প্রথম ফলাফল প্রকাশ করেন। আমেরিকান প্রফেসর জোসেফ ক্লোয়েপার (Joseph W. Kloepper) ২০০৪ সালে আন্তঃকোষীয় উপকারী নভেল বেসিলাস (Bacillus) ব্যাক্টেরিয়াকে নিরাপদ বালাই নাশক হিসেবে আখ্যায়িত করেন। যুক্তরাজ্যের SRUC এর এমিরেটাজ প্রফেসর ওয়েটারস (Waters) ২০০৫ সালে উপকারী জীবাণুর ব্যবহারকে নিরাপদ বালাই নাশক বলে আখ্যায়িত করেছেন। পরে ২০০৯ সালে পাইটারস (Pieterse) কর্তৃক বিশ্বের সেরা জার্নাল নেচার-এ বেসিলাস (Bacillus) নিয়ে গবেষণা প্রকাশনার পর সারা দুনিয়া জুড়ে আবার ও হৈচৈ পড়ে যায়। উক্ত ধারাবাহিকতায় বিশ্বের বহুদেশে আন্তঃকোষীয় উপকারী নভেল বেসিলাস (Bacillus) ব্যাক্টেরিয়া এবং এর থেকে উৎপাদিত জৈব পণ্য (Formulated Product) কৃষিতে আজ ব্যবহার হচ্ছে। চাইনিজ বিজ্ঞানী নিউ (Niu) ২০১১ সালে জানান, আন্তঃকোষীয় উপকারী বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া *Bacillus cereus* সেলিসাইলিক এবং জেসমনিক এসিড (হরমন) নামক দুই পথেই গাছকে রোগের কবল হতে রক্ষা করে। এই আবিষ্কারের পর এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। গবেষণায় দেখা যায়, *Bacillus cereus* গাছের ট্রান্সক্রিপ্সান ফেক্টর *NPR* নিয়ন্ত্রণ করে। উক্ত অধ্যায়টি আরও বেগবান হয়, যখন ২০১৩ সালে মারগারেট মেকফল এনজাই (Margaret McFAll-Ngai) আমেরিকা হতে প্রকাশিত PNAS-জার্নালে উল্লেখ করেন, ব্যাক্টেরিয়ার সাথে মানব দেহের জীনম সিকুয়েন্সিং সব চেয়ে বেশি মিল যা ৩৭%, যেখানে মানুষের সাথে বানরের মিল মাত্র ৬%। (McFall-Ngai, *et al.*, 2013)

এই আবিষ্কারের পর সারা পৃথিবী জুড়ে আবারও আরেকবার হৈচৈ পড়ে যায়; নজর কেড়ে নেয় উপকারী নভেল বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া। কারণ বেসিলাস গ্রাম পজিটিভ ব্যাক্টেরিয়া যা এন্ডোস্পোর গঠন করে প্রকৃতিতে দীর্ঘ দিন বিভিন্ন প্রতিকূলতায় বাঁচতে পারে যা গাছকে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করে থাকে। আমাদের কর্মসূচির আন্তঃকোষীয় উপকারী বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া *Bacillus oryzicola* YC7007 ২০১৫ সালে নতুন নভেল প্রজাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে (Chung and Hossain ২০১৫) যা আন্তর্জাতিক প্ল্যান্ট প্যাথলজি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। ব্যাক্টেরিয়াটির ব্যবহার নিয়ে চারটি প্যাটেন্ট US9862955B2, US20170191072A1, WO2015183003 এবং A1WO2014175496A8 ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক ভাবে সমাদৃত হয়েছে; যার মধ্যে US9862955B2 ও US20170191072A1 ইউ এস এ কর্তৃক অনুমোদিত (https://patents.justia.com/inventor/mohammad-tofajjal-hossain)।

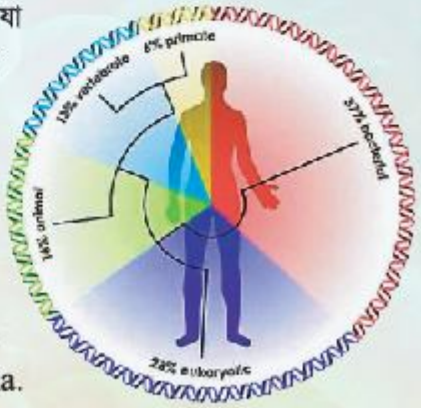

বেসিলাস (Bacillus) ব্যাক্টেরিয়াটি রোগ প্রতিরোধী (Antagonistic) উপকারী জীবাণু হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভাবে কাজ করে আসছে (Hossain *et al.* ২০১৬)। *Bacillus oryzicola* YC7007 এবং আরেকটি আন্তঃকোষীয় উপকারী বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া *Bacillus velezensis* GL6 এর সমন্বয়ে EMOs করা হয়েছে যা আমাদের প্রকল্পের গবেষণা মাঠগুলোতে ব্যবহার করা হয়েছে।

ব্যাক্টেরিয়ার ব্যবহার

প্রায় সকল প্রাণী টিকে থাকার জন্য ব্যাক্টেরিয়ার ওপর নির্ভরশীল। কারণ কেবল ব্যাক্টেরিয়া ভিটামিন বি-১২ (কোবালামিন) সংশ্লেষণে প্রয়োজনীয় জিন ও উৎসেচক সরবরাহ করে। ভিটামিন বি-১২ পানিতে দ্রবণীয় একটি ভিটামিন যা মানবদেহের প্রতিটি কোষের বিপাকে জড়িত। এটি DNA সংশ্লেষণে এবং ফ্যাটি অ্যাসিড ও অ্যামিনো এসিড উভয়ের বিপাকে একটি সহ-উৎপাদক (Co-factor) হিসেবে ভূমিকা রাখে। আবার, ব্যাক্টেরিয়া বায়ুমন্ডল থেকে নাইট্রোজেন সংবদ্ধকরণের মাধ্যমে পুষ্টি চক্রে (Nutrient cycle) অপরিহার্য ভূমিকা রাখে।

মানুষ ও অধিকাংশ প্রাণীতে সর্বাধিক সংখ্যক ব্যাক্টেরিয়া থাকে। অন্ত্রে ও ত্বকে ব্যাক্টেরিয়া একটি বিরাট অংশ থাকে। যদিও অনেক ব্যাক্টেরিয়া বিশেষ করে অন্ত্রের গুলো মানুষের জন্যে উপকারী। এছাড়া জৈব প্রযুক্তিতে, অ্যান্টিবায়োটিক ও অন্যান্য যৌগ তৈরিতেও ব্যাক্টেরিয়ার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আজকাল কৃষিক্ষেত্রেও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হচ্ছে। শিল্পক্ষেত্রে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এবং পতিত তেলের (Oil spill) ভাঙনে, গাঁজন প্রক্রিয়ায় পনির ও দই উৎপাদন এবং খননকার্যে ব্যাক্টেরিয়ার ভূমিকা রয়েছে। সোনা, প্যালেডিয়াম, তামা ও অন্যান্য ধাতু পুনরুদ্ধারেও ব্যাক্টেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ছবি: উপকারী নভেল বেসিলাস এন্টাগনেস্টিক (Antagonistic) কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছেন মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ, বিএআরআই (২১ জুন ২০১৯)। কর্মসূচির অর্থায়নে ক্রয়কৃত আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছেন মহাপরিচালক, ড. মো. নাজিরুল ইসলাম, বিএআরআই (১৭ আগষ্ট ২০২১)।

বেগুনের ঢলে পড়া রোগ দমনে উপকারী বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া

বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির খাদ্য তালিকায় বেগুন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদজাত ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ খাদ্য। দারিদ্রতা ও অপুষ্টি দূরীকরণে এই ফসলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । দেশের বেশীরভাগ জনগোষ্ঠির কাছে এখনও এই সবজি ফসল মুখরোচক বেগুনভাজা হিসেবে বিবেচিত। দরিদ্র জনগোষ্ঠির পুষ্টি স্বল্পতা দূর করতে, মাটির হারানো উর্বরতা ফিরে পেতে, মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে, কৃষককুলের আয় বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা, সর্বোপরি নিরাপদ বিষমুক্ত খাদ্য ও ফসলের ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব টেকসই কৃষি প্রযুক্তি নিশ্চিত করে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে রোগমুক্ত বেগুনের আবাদ বৃদ্ধি এ সময়ের অপরিহার্য দাবী। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে আন্তঃকোষীয় উপকারী নভেল বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া থেকে উৎপাদিত জৈব পণ্যের মাধ্যমে বেগুনের ঢলে পড়া রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার কর্মসূচির কার্যক্রম চলছে। আমরা সকলে জানি, বেগুন বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় সবজি। ধনী-দরিদ্র সকলেই এ সবজি পছন্দ করে। সারা বছর ধরে বাণিজ্যিকভাবে এ সবজি চাষ করা হয়।

সারা দেশে ১২.০৩% জমিতে এ সবজির চাষাবাদ হয়। বিবিএস ২০২০ এর তথ্যমতে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে শুধু রবি মৌসুমে এর ফলন ৩৬০ হাজার মেঃ টন এবং খরিফ মৌসুমে ১৭০ হাজার মেঃ টন উৎপাদন হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট এ যাবৎ ১৬ টি বিভিন্ন প্রকারের বেগুনের জাত উদ্ভাবন করেছে। তার মধ্যে শুধু বারি বেগুন-৮, বারি বেগুন-১০ উইল্টিং/ ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী। দুঃখের বিষয় এর ফলন মাটি ও বীজ বাহিত জীবাণু এবং রোগের কারণে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসছে। তার মধ্যে বেগুনের ঢলে পড়া রোগ অন্যতম। বীজ শোধণসহ উক্ত রোগ দমন করার জন্য আমাদের দেশের কৃষকেরা গত এক দশক ধরে রাসায়নিক বালাই নাশকের ব্যবহার যত্রতত্রভাবে করে আসছে। চাষীরা মৌসুমে ১৬০-১৮০ বার পর্যন্ত রাসায়নিক বালাই নাশক ব্যবহার করে থাকে (BARI web: www.bari.gov.bd)। উক্ত রাসায়নিক বালাই নাশক ব্যয়বহুল এবং পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলে বিভিন্ন গবেষণায় প্রতিয়মান হয়েছে। রোগ ব্যবস্থাপনা জ্ঞানের অভাবে প্রতি বছর উক্ত সবজির ২৪-৪৪% নষ্ট হচ্ছে। শুধু ঢলে পড়া রোগের কারণে ক্ষেত্রবিশেষে বেগুনের ৭৫-৯৫% ফলন নষ্ট হতে পারে (Artal *et al.*, ২০১২)। সুতরাং বেগুনের ঢলে পড়া রোগ দমন ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে বেগুনের জন্য প্রধান সমস্যা হচ্ছে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা এবং ঢলে পড়া রোগ। বিটি প্রযুক্তির মাধ্যমে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দমন করা গেলেও এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে বেগুনের ঢলে পড়া রোগ দমনের উল্লেখযোগ্য কোন কার্যকারী ব্যবস্থা নেই। ২০১৬-২০১৮ সময়কালে বেগুনের ঢলে পড়া রোগ দমনে প্রাথমিক পর্যায়ে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, হাটহাজারী, চট্টগ্রামে পরীক্ষাকার্য চালিয়ে আশানুরুপ ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। গবেষণায় কৃত্রিমভাবে বেগুনের ঢলে পড়া জীবাণু *Ralstonia solanacearum* pv. *brinjal* RARS Hat3 গাছে প্রয়োগ করে পরীক্ষা করা হয়েছে। উপকারী বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া ব্যবহার করে দেখা গিয়েছে যে, জীবাণু প্রয়োগ করার পরে কাঙ্খিত মাত্রায় রোগ দমন করা সম্ভব যা কন্ট্রোল এর সাথে তুলনা করে গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। সুতরাং কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের কৃষি বিশেষ করে গণমানুষের খাদ্যের নিরাপত্তা, পুষ্টিযুক্ত রোগ-বালাই ও ভেজালমুক্ত করণে উপকারী জীবাণু ব্যবহারের বিকল্প নেই।

উপকারী ব্যাক্টেরিয়া কিভাবে সংগ্রহ করা হয়?

যেকোন কাঙ্খিত ১ গ্রাম নুমুনা ভাল ভাবে ধৌত করে ৯৫% ইথানল দিয়ে ১০ মিনিট ধৌত করতে হবে। তারপর ১.২% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দিয়ে পুনরায় ১০ মিনিট ধৌত করতে হবে গন্ধ না যাওয়া পর্যন্ত। মর্টাল পেস্টেল দিয়ে পেস্ট করতে হবে। ৮৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১০ মিনিট রাখার পর লবণাক্ততা সহনীয় ব্যাক্টেরিয়া সংগ্রহ করতে হলে সল্ট সকিং (Shocking) করতে হবে। তারপর সিরিয়াল ডাইলোশন (Serial dilution) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্লেটিং করতে হবে।

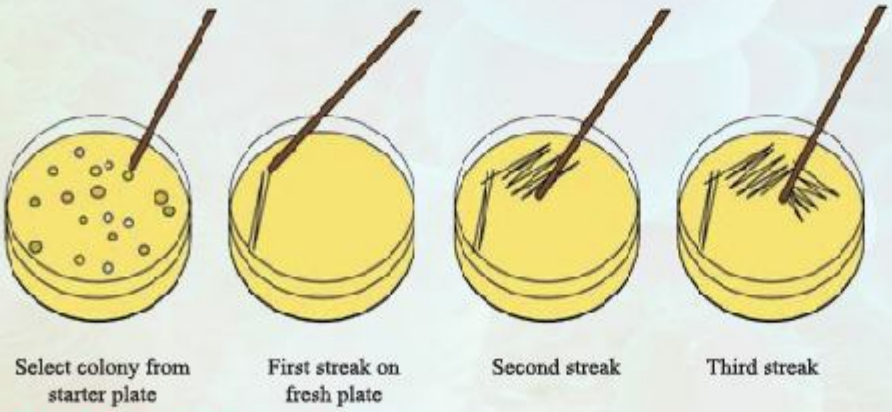

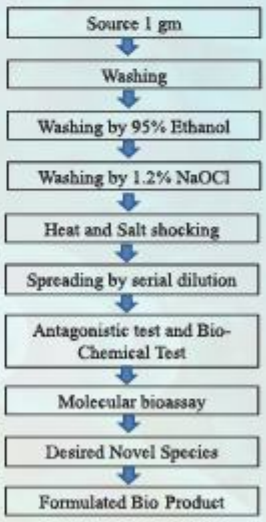

ব্যাক্টেরিয়া কিভাবে স্ট্রিকিং করা হয়?

প্রথমে পেট্রি প্লেটকে চার ভাগে ভাগ করতে হবে। একটি কলোনি লোপ দিয়ে প্রথম ভাগে আঁকাবাঁকা করে দাগ কাটতে হবে। পরবর্তীতে শেষ ভাগ হতে টান দিয়ে দ্বিতীয় ভাগ আঁকাবাঁকা করে টান দিতে হবে। এই ভাবে চার ভাগ শেষ করতে হবে।

কিভাবে ব্যাক্টেরিয়ার গ্রাম পরীক্ষা করা হয় ?

একটি স্বচ্ছ স্লাইডে লোপ দিয়ে বিশুদ্ধ কলোনি (pure colonies) ঘষে স্থাপন করতে হবে, পরে হিট করে শুকাতে হবে যাকে ফিক্সেশান (Fixation) বলে। এক মি.লি. ক্রিস্টাল ভায়োলেট (Crystal Violet) নিয়ে হিটিং করে শুকিয়ে নিতে হবে। পরবর্তীতে আয়োডিন ট্রিটমেন্ট (Iodine Treatment) দিয়ে হিটিং করে শুকিয়ে নিতে হবে। এরপর ১০০% ইথানল নিয়ে ধৌত করে নিতে হবে যাকে ডিকালারাইজেশন (Decolorisation) বলে। পরবর্তীতে এক মি.লি. সেফরানিন (Safranin) দিয়ে হিটিং করে শুকিয়ে দিয়ে প্লেটের উপর স্বচ্ছ কভার স্লাইড দিয়ে ঢেকে নিয়ে প্রাপ্ত ব্যাক্টেরিয়া সমূহকে মাইক্রোস্কোপ এর সাহায্যে রং (Colour) দেখতে হবে। যদি রং (Colour) বেগুনী হয় তাহলে বুঝতে হবে এগুলো গ্রাম পজিটিভ ব্যাক্টেরিয়া আর যদি রং (Colour) গোলাপী হয় তাহলে বুঝতে হবে এগুলো গ্রাম নেগেটিভ ব্যাক্টেরিয়া।

STREAK PLATE METHOD

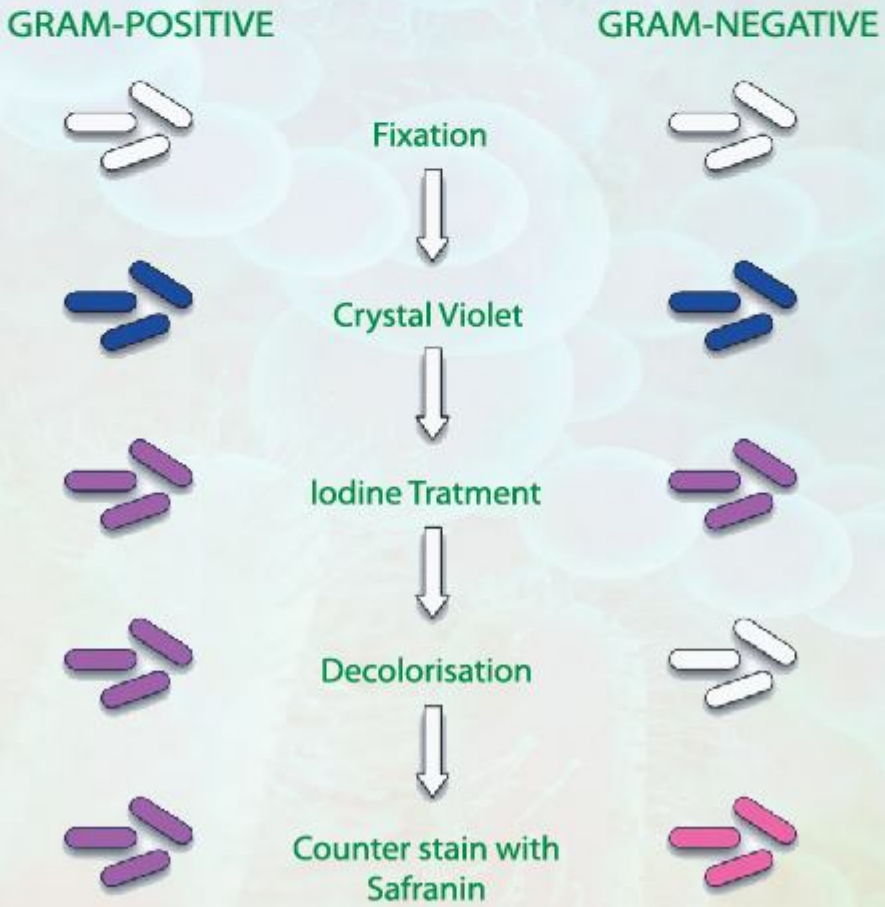

ব্যাক্টেরিয়া কিভাবে জমিতে প্রয়োগ করা হয়?

উপকারী ব্যাক্টেরিয়া *Bacillus oryzicola* YC7007 এবং *Bacillua velezensis* GL6 ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং ১৮০ আরপিএম-এ সারা রাত সেকারে জন্মিয়ে সেন্ট্রিফিউগেশানের মাধ্যমে সেল সংগ্রহ করে তা ১০ mM MgSO4 এর সাথে মিশেয়ে ১০% হারে v/w পরিমাপে গাছে প্রয়োগ করতে হবে টব পরীক্ষাকার্যের জন্য; যেখানে ব্যাক্টেরিয়ার কুরাম থাকবে ২x১০^{৭} CFU/ml। গাছে এটি পাওডার, দানাদার অথবা তরল আকারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। দানাদার এবং তরল আকারে গবেষণা এলাকায় প্রয়োগ করা হয়েছে। এর ফলে ভাল ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। মূলতঃ Pseudomonas এবং Bacillus গণের অন্তর্ভূক্ত মৃত্তিকা ব্যাক্টেরিয়া মৃত্তিকায় অদ্রবনীয় ফসফেটকে দ্রবীভূত করে উদ্ভিদের ফসফরাস পুষ্টিতে সহায়তা করে। এ সকল ব্যাক্টেরিয়া জৈব অ্যাসিড যেমন ফরমিক অ্যাসিড, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, ল্যাকটিক অ্যাসিড, সাকসিনিক অ্যাসিড এবং ফিউমারিক অ্যাসিড নির্গত করে মাটির পিএইচ কমিয়ে দিয়ে ফসফরাসকে দ্রবীভূত করে। ফসফরাস দ্রবীভূত করার ব্যাক্টেরিয়া, যেমন- থায়োব্যাসিলাস সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে অদ্রবণীয় রকফসফেট দ্রবীভূত করে উদ্ভিদের ফসফরাস আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

EMOs এর পুরো নাম হলো Effective Microbial Organisms যাকে EM/EMOs বলে। এটি *Bacillus velezensis* GL-6 এবং *Bacillus Oryzicola* YC7007 দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। ব্যাক্টেরিয়ার সেলের সাথে বিভিন্ন স্টেরিলাইজড জৈব পণ্য ব্যবহার করে EMOs দানাদার আকারে তৈরী করা হয়েছে। EMOs এ Bacterial CFU/G বৃদ্ধি করে ১০^{১০} করার জন্য গবেষণা চলমান রয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগের ১৬ টি এলাকারয় এই গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। BARI Bt Begun 2 ঢলে পড়া রোগ সংবেদনশীল (Susceptible) বেগুনের জাতটি উক্ত পরীক্ষাকার্যে ব্যবহার করা হয়েছে। জমিতে উপকারী নভেল বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়ার Self life দেখা হয়েছে এবং তাদের সংখ্যা মাঠে ১০^{৬} হতে ক্ষেত্রবিশেষে ১০^{৭} CFU/gm পাওয়া গিয়েছে।

জমি তৈরীর সময় ১৫০ গ্রাম প্রতি বর্গমিটার জমিতে প্রয়োগ করতে হবে; অর্থাত হেক্টর প্রতি ১.৫ টন EM/EMOs প্রয়োগ করতে হবে। পরে কালো পলিথিন দিয়ে ২১ দিন ঢেকে রাখতে হবে। তারপর চারা রোপণ করতে হবে। রোপন পরবর্তীতে প্রতি ২০ বিশ দিন অন্তর অন্তর মোট তিন বার প্রতি গাছে ২০ গ্রাম হারে EM/EMOs প্রায়েগ করতে হবে। ষাট (৬০) দিনের বয়স ও সত্তর (৭০) দিনের বয়সে দুই বার OD=0.১/৬০০nm) হারে অর্থাত ২ x ১০^{৭} CFU/ml আকারে ব্যাক্টেরিয়া মাটিতে স্প্রে করে প্রয়োগ করতে হবে। উক্ত প্রয়োগের ফলে বেগুনের ঢলে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

ছবি: ব্যাক্টেরিয়া প্রয়োগের ধাপসমূহ

গবেষণার মাঠে দেখা গিয়েছে তিন মাসের বয়সের গাছে যেখানে উপকারী ব্যাক্টেরিয়া প্রয়োগ করা হয়েছে সেখানে কোন গাছ ঢলে পড়ে নাই। পক্ষান্তরে কন্ট্রোলে ৬০-৮০% গাছ ঢলে পড়েছে।

ছবি: বামে কন্ট্রোল (যেখানে নভেল বেসিলাস প্রয়োগ করা হয়নি) ডানে ট্রিটেড প্লট (যেখানে নভেল বেসিলাস প্রয়োগ করা হয়েছে) স্থান: চন্দ্রপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

References

Annonymous 2020. Statistical Year Book of Bangladesh 2019. Bangladesh Bureau of Statistics, Planning Division, Ministry of Planning, Dhaka, Bangladesh. P- 41

Artal, R. B., Gopalakrishnan, C., & Thippeswamy, B. 2013. An efficient inoculation method to screen tomato, brinjal and chilli entries for bacterial wilt resistance. Pest Management in Horticultural Ecosystems 18: 70-73

Chester K 1933. The problem of acquired physiological immunity in plants. Q Rev Biol 8:129-151

Chung EJ, Hossain MT, Khan A, Kim KH, Jeon CO, Chung YR. 2015. Bacillus oryzicola sp. nov., an endophytic bacterium isolated from the roots of rice with anti-microbial, plant-growth-promoting, and systemic resistance-inducing activities in rice. Plant Pathol J 31: 152-164

Claus D, Berkeley RCW 1986. Genus Bacillus Cohn 1872. In: Sneath PHA, Mair NS, Sharpe ME, Holt JG (eds) Bergey's manual of systematic bacteriology, vol 2. Williams and Wilkins, Baltimore, pp 1105-1139

Hossain MT, Khan A, Chung EJ, Rashid HO, Chung YR 2016. Biological control of rice bakanae by an endophytic Bacillus oryzicola YC7007. Plant Pathol J 32: 228-42

Kloepper JW, Ryu CM, Zhang S 2004. Induced systemic resistance and promotion of plant growth by Bacillus spp. Phytopathol 94: 1259-1266

McFall-Ngai, M., Hadfield, M. G., Bosch, T. C., Carey, H. V., Domazet-Lošo, T., Douglas, A. E., .. & Wernegreen, J. J. 2013. Animals in a bacterial world, a new imperative for the life sciences. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110: 3229-3236

Niu DD, Liu HX, Jiang CH, Wang YP, Wang QY, Jin HL, Guo JH 2011. The plant growth- promoting rhizobacterium Bacillus cereus AR156 induces systemic resistance in Arabidopsis thaliana by simultaneously activating salicylate-and jasmonate/ethylene-dependent signaling pathways. Mol Plant Microbe Interact 24:533-542

Pieterse CMJ, Leon-Reyes A, Van der Ent S, Van Wees SC 2009. Networking by small-molecule hormones in plant immunity. Nat Chem Biol 5: 308-316

Van Loon LC 1982. Regulation of changes in proteins and enzymes associated with active defense against virus infection. In: Wood RKS (ed) Active defense mechanisms in plants, vol 1. Plenum Press, New York, pp 247-273

Van Peer R, Schippers B 1992. Lipopolysaccharides of plant growth promoting Pseudomonas sp. strain WCS417r induces resistance in carnation to Fusarium wilt. Neth J Pl Path 98:129-139

ফসলের রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশকের ক্রমবর্ধমান ইতিহাস

ড. মো. ইকবাল ফারুক
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর

ভূমিকা

গ্রিক দার্শনিক থিওফ্রাসটাস (Theophrastus) (খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০) হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি গাছ, শস্য এবং ডালের রোগ নিয়ে প্রথম অধ্যয়ন এবং লেখালেখি করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আবহাওয়া রোগ নিয়ে আসত এবং তা ঈশ্বরের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হতো। উদ্ভিদের রোগ ছিল ঈশ্বরের মূল্যের বহিঃপ্রকাশ। ধর্মীয় বিশ্বাস, কুসংস্কার অথবা তারকা চন্দ্রের এবং খারাপ বায়ুর প্রভাবে তা সংঘটিত হতো। যেমনঃ রোমানরা দানাজাতীয় শস্যের মরিচা রোগের জন্য প্রকৃতপক্ষে একটি বিশেষ ধরনের রবিগো (Robigo) নামক মরিচা দ্বারা যা ঈশ্বর তৈরি করেছিল বলে বিশ্বাস করত। যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পর মধ্য সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে বিজ্ঞানীগণ রোগাক্রান্ত উদ্ভিদের সঙ্গে যুক্ত অনেক অণুজীব দেখতে সক্ষম হন এবং মিলডিউ, মরিচা এবং আক্রান্ত গাছে অন্যান্য উপসর্গ ও অণুজীবের উপস্থিতি থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করেন। লুই পাস্তর ১৮৬০-৬৩ সালে অকাট্য প্রমাণ দেন যে, অণুজীবসমূহ শুধু প্রাক বিদ্যমান অণুজীব থেকে আসে এবং গাজন প্রক্রিয়া একটি জৈবিক ঘটনা কেবলমাত্র রাসায়নিক ঘটনা নয়। একটি উদ্ভিদকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক হিসেবে তখনই স্বীকৃতি দেয়া যায় যখন তা তার বংশগতির সম্ভাবনার সেরাটাসহ তার শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী সুচারুরূপে সম্পাদন করতে পারে। রোগ-জীবাণু দ্বারা উদ্ভিদের বিভিন্নভাবে রোগ হতে পারে, যেমনঃ-

* **ক্রমাগত নিজেদের ব্যবহারের জন্য পোষক কোষ থেকে খাদ্য শুষে পোষককে দুর্বল করার মাধ্যমে**
* **বিষাক্ত এনজাইম বা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক পদার্থসমূহ নিঃসরণ করে পোষককে মেরে ফেলা বা পোষক কোষের বিপাক ক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটানোর মাধ্যমে**
* **খাদ্য, খনিজ, পুষ্টি এবং পানি পরিবাহী টিস্যুসমূহকে অবরোধ করার মাধ্যমে**
* **পোষক কোষের উপাদানসমূহ যেগুলো তাদের সংস্পর্শে থাকে তাদেরকে ভক্ষণ করার মাধ্যমে**

আমেরিকান ফাইটোপ্যাথোলজিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক গৃহীত এবং ব্রিটিশ মাইকোলজিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক বর্ণিত সংজ্ঞা অনুয়ায়ী "রোগ হচ্ছে এমন একটি অকার্যকর প্রক্রিয়া যা ক্রমাগত জ্বালা সৃষ্টির কারণে অনুষ্ঠিত হয় এবং যার ফলশ্রুতিতে কিছু যন্ত্রনা উৎপাদনকারী উপসর্গ তৈরি হয়।" সুতরাং, উদ্ভিদের রোগ হচ্ছে কাঠামোগত বা শারীরতাত্ত্বীয় অস্বাভাবিকতা বা উভয় অবস্থা যা কোন একটি জীব বা প্রতিকূল অবস্থার প্রভাবে উদ্ভিদ বা তার অংশবিশেষ বা উৎপাদিত পণ্যকে প্রভাবিত করে এবং যার কারণে তাদের অর্থনৈতিক মূল্য কমে যেতে পারে।

উদ্ভিদ রোগের গুরুত্ব

উদ্ভিদের রোগ কখনও কখনও মহামারী হিসেবে বিস্তার লাভ করে এবং বিশাল এলাকাজুড়ে জন্মানো ফসলকে ধ্বংস করতে পারে। এরা ফসলের জমিতে ক্ষতির পাশাপাশি গুদামে সংরক্ষিত গুদামজাত পণ্যেরও ক্ষতি করে থাকে। যে কোন সময় এবং উদ্ভিদের যে কোন পর্যায়ে যথা বীজ বপন থেকে শুরু করে ফসল গুদামজাত করা পর্যন্ত রোগের সৃষ্টি হতে পারে এবং এর ফলে বিশাল আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। কেবলমাত্র এশিয়াতেই শত শত কোটি টাকার খাদ্যশস্য রোগের কারণে প্রতিবছর ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। উদ্ভিদের রোগের কারণে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হওয়ার উদাহারণ যা প্রায়ই উদ্ভিদের রোগের ইতিহাস উদ্ধৃত করার সময় স্মরণ করা হয়। এধরনের উদ্ভিদের রোগের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে ফাইটোপথোরা ইনফেসটেন্স (*Phytophthora infestans*) নামক ছত্রাকের দ্বারা ১৮৪৭ সালে আয়ারল্যান্ডে আলুর লেট ব্লাইট বা আলুর নাবী ধ্বসা; ১৮৭০ সালে শ্রীলঙ্কার হেমিলেই ভাসটেরিক্স (*Hemilei vastarix*) দ্বারা কফি জং ধরা (কফি রাস্ট); ১৯৩০ সালে মধ্য দক্ষিণ আমেরিকায় মাইকোফেয়িরিলা মুসিকলা (*Mycosphaerella musicola*) দ্বারা সৃষ্ট কলা পাতার সিগাটোকা দাগ রোগ; হেলমিনথোসপোরিয়াম ওরাইজি (*Helminthosporium oryzae*) নামক ছত্রাকের দ্বারা ধানের পাতার দাগ রোগের কারণে ১৯৪২ সালে ভারতে প্রসিদ্ধ "বাংলা দুর্ভিক্ষ" এর সৃষ্টি হয় এবং প্রায় দুই লক্ষ মানুষ অনাহারে মারা যায়। ফসল উৎপাদনে রোগের প্রভাব এবং তাদের দ্বারা সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণে উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিজ্ঞান বিশ্বের প্রায় সকল দেশে দৃষ্টি আর্কষণে সমর্থ হয়েছে।

উদ্ভিদ রোগ ব্যবস্থাপনা ইতিহাস

এটি খুব একটা বিস্ময়কর নয় যে, এক শতক আগে ছত্রাকনাশক সম্পর্কিত জ্ঞান এবং মান খুবই অপূর্ণাঙ্গ ছিল। রোগ ব্যবস্থাপনা ইতিহাসে তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায় রয়েছে, যেমন- প্রথাগত পদ্ধতির যুগ, ছত্রাকনাশকের/ ব্যাক্টেরিয়ানাশকের যুগ এবং আইডিএম-এর যুগ।

প্রথাগত পন্থার যুগ

এ সময় মানুষ গ্রামে একত্রিত হয়ে বসবাস শুরু করে এবং নদীর কাছাকাছি উর্বর উপত্যকায় নির্বাচিত খাদ্য-শস্য আবাদ শুরু করে এবং তখন থেকেই রোগবালাই ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়। বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মানুষ শিখতে শুরু করে কিভাবে অবস্থার উন্নতি এবং পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ফসল রক্ষার জন্য পরিচর্যাগত এবং ভৌতিক দমন পদ্ধতির অনুশীলন করতে শিখে। বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন ফসলের অবশিষ্টাংশ ধ্বংস করা, রোগাক্রান্ত গাছকে তুলে ফেলা, চাষের মাধ্যমে মাটি বাহিত রোগ-জীবাণুকে বাহিরে বের করে দেয়া এবং নির্মূল করা, রোগ এবং পোকামাকড়ের বিকল্প পোষককে অপসারণ করা, বপনের/রোপণের সময় নিরূপণ করা, শস্যাবর্তন মেনে চলা, ফাঁদ ফসলের ব্যবহার, উপযুক্ত রোপণের স্থান নির্ণয় করা, ডালপালা ছাঁটাই করা, সালফারের গুঁড়া ব্যবহার করা এবং অন্যান্য পদ্ধতির প্রয়োগ করে অনেক ফসলের বিভিন্ন রোগের সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ কমানো যায়। এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে নিম, চন্দ্রমল্লিকা, তামাক এবং আরও অন্যান্য উদ্ভিদ থেকে উৎপন্ন পণ্য সমূহ দিয়ে রোগ ব্যবস্থাপনা শুরু হয়। এই ধরনের পরিচর্যাগত এবং ভৌতিক রোগ দমন ব্যবস্থাপনা আজও খুবই উপযোগী বলে বিবেচিত।

ছত্রাকনাশকের যুগ

অনেক উদ্ভাবনের মধ্যে প্রথম ছত্রাকনাশকের 'উদ্ভাবন' ছিল খুব ভাল পর্যবেক্ষণের ফলাফল। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি বান্ট রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য লবণ পানি দিয়ে শস্যের বিরিনিং (Brining) এবং এরপর লাইমিং (Liming) এর প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রতীয়মান হয় যে, সমুদ্র থেকে উদ্ধারকৃত বীজ গমের বান্ট রোগ থেকে মুক্ত ছিল। ১৯৪০ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত একটি নতুন রাসায়নিক শ্রেণী হিসেবে অনেক সংখ্যক ছত্রাকনাশক আবির্ভূত হয়। ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ এর দশকে বহুল ব্যবহৃত রক্ষাকারী ছত্রাকনাশক ম্যানকোজেব (Mancozeb) এবং ক্লোরোথালোনিল (Chlorothalonil) এর প্রচলন হয়। এই দশকেই প্রথম অন্তর্বাহী বা সিসটেমিক থাইয়াবেনডেজল (Thiabendazole) এবং অন্তর্বাহী বা সিসটেমিক বীজ শোধক কার্বক্সিন (Carboxin) এর ব্যবহার শুরু হয়। গ্রিনহাউজে পাউডারি মিলডিউয়ের প্রতি বেনজিমিডেজলস (Benzimidazoles) এর সহনশীলতার ঘটনা প্রথম পরিলক্ষিত হয় ১৯৬৯ সালে। পরবর্তীতে ১৯৮০ এর দশকে ইউরোপিয়ান শস্য বাজারে ফেনপ্রপিডিন (Fenpropidin) এবং ফেনপ্রপিমোর্ফ (Fenpropimorph) অন্যতম প্রধান ছত্রাকনাশক ছিল। অন্যদিকে সিগাটোকার জন্য ট্রাইডেমোরফ (Tridemorph) ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো এবং তার সাথে বীজশোধক কার্বক্সিন (Carboxin) যা বান্টস্ (Bunts), স্মাটস্ (Smuts) রোগ এবং হরেক রকম ব্যাসিডিওমাইসিটিস (Basidiomycetes) যেমন- রাইজোকটোনিয়া (Rhizoctonia) প্রজাতির জন্য অত্যন্ত কার্যকর। পরবর্তী দশকসমূহে কৃত্রিম ছত্রাকনাশকের নিবিড় এবং ব্যাপক ব্যবহার, অপব্যবহার এবং অবিবেচকের মত ব্যবহার পরিবেশের বিস্তৃত ক্ষতির কারণ হয়ে পড়ে। উপরন্ত কৃত্রিম ছত্রাকনাশকের ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে কোন কোন ফসলের রোগ বালাইয়ের সমস্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে ছত্রাকনাশকের ব্যবহার আরও বৃদ্ধি পেয়ে একটি একঘেয়ে কর্মতৎপরতায় পরিণত হয়। এইসব সমস্যার সম্মিলিত প্রভাব এবং সেই সাথে ছত্রাকনাশকের ক্রমবর্ধমান খরচ বৃদ্ধি যুগপৎভাবে রাসায়নিক দমন ব্যবস্থার সীমিত ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় মতামত তৈরি এবং আইডিএম-এর ধারণা উদ্ভাবনে সহায়তা করে।

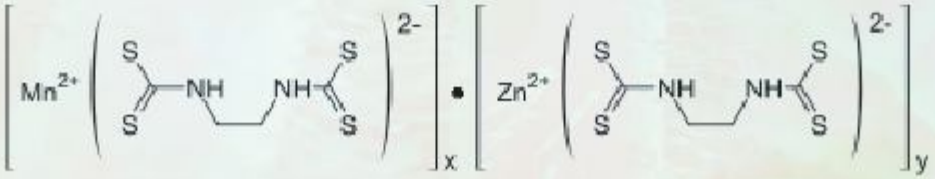

আইডিএম-এর যুগ

'আইডিএম' শব্দটি সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) হতে এসেছে। উনিশ শত' ষাটের দশকের শেষের দিকে পরিবেশবান্ধব ফসল সংরক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবনের একটি আন্দোলন শুরু হয়। অর্থনীতিই ছিল বালাইনাশক প্রয়োগের সময়সূচি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফসলের নজরদারী করার প্রধান সঞ্চালক এবং এটিই আইপিএম-এর ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে প্রথম পদক্ষেপ। আইডিএম-এর বেলায় বালাইনাশকের ব্যবহার খুবই সামান্য পরিমাণে এবং যদি কেবল প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তখন ব্যবহারের কথা বলা হয়। আইডিএম-এর অন্যান্য পদ্ধতিসমূহ, যেমন-পোষক উদ্ভিদের প্রতিরোধ ক্ষমতা/সহনশীলতা, পরিচর্যাগত এবং জৈবিক দমন পদ্ধতিসমূহকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই একবিংশ শতাব্দীতে টেকসই কৃষি (Agricultural sustainability) শব্দটি আধুনিক কৃষিতে একটি আদর্শে পরিণত হয়েছে এবং রোগ দমনের অসংখ্য অ-রাসায়নিক পদ্ধতি, যেমন-রোগ সংক্রামক জীবাণুমুক্ত বীজ, রোগ প্রতিরোধী জাত, শস্য পর্যায় অবলম্বন, উদ্ভিদের নির্যাস, জৈব সংশোধনী, জৈব ফসলের চাষাবাদ (Organic farming) এবং জৈবিক দমন ব্যবস্থা, কৃত্রিম রাসায়নিক বালাইনাশকের তুলনায় কম ক্ষতিকর বিধায় প্রচলিত কৃষি জৈব ফসলের চাষাবাদ (Organic farming) অথবা মাটিবিহীন চাষাবাদের ক্ষেত্রে আইডিএম ব্যবহারের বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। কোন একক পদ্ধতি ফসলের রোগের সন্তোষজনক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে পারে না। সমস্ত কার্যকর এবং পরিবেশবান্ধব পদ্ধতির সাথে গতিশীল কৃষি পরিবেশ ব্যবস্থাপনাই হবে ফসলের রোগ দমন ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি।

সমন্বিত রোগ ব্যবস্থাপনা (আইডিএম) সফল সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) পদ্ধতি হতে প্রাপ্ত একটি ধারণা যা মাঠ পর্যায়ে নজরদারির সাথে বিভিন্ন কৌশল এবং পন্থার একত্রে এবং সময়মত প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে গঠিত। এর অন্তর্গত হচ্ছে জমি নির্বাচন এবং তৈরি করা, প্রতিরোধী জাতের ব্যবহার, রোপণ পদ্ধতির পরিবর্তন, পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে পরিবেশগত পরিবর্তন, সেচ, ডালপালা ছাঁটাইকরণ, পাতলাকরণ, ইত্যাদি এবং প্রয়োজন হলে বালাইনাশকের ব্যবহার করা। কিন্তু এই সমস্ত প্রথাগত ব্যবস্থা ছাড়াও পরিবেশগত বিষয়সমূহ (তাপমাত্রা, আদ্রতা, মৃত্তিকার অম্লতা (pH), পুষ্টি ইত্যাদি) রোগের পূর্বাভাস এবং অর্থনৈতিক দ্বারপ্রান্ত (ETL) পর্যবেক্ষণ সমন্বিত রোগ ব্যবস্থাপনার জন্য অপরিহার্য। প্রতিটি উপাদান হতে সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে এই পন্থাগুলি একত্রিত সমন্বিত এবং সঙ্গতিপূর্ণ উপায়ে প্রয়োগ করা উচিত।

আইডিএম-এর প্রধান লক্ষ্যগুলো হল

* প্যাথজেনিক ইনোকুলাম বা রোগের উৎসকে কমানো বা বর্জন করা
* প্রাথমিক প্যাথজেনিক ইনোকুলাম বা রোগের উৎসের কার্যকারিতা কমানো
* পোষকের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ/সহনশীলতা বৃদ্ধি করা
* রোগের সূত্রপাত বিলম্বিত করা
* মাধ্যমিক চক্রকে ধীরগতি করা
* বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার করা যার নিয়মিত ব্যবহার রোগ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে

জৈবিক দমন ব্যবস্থাপনা

রোগ দমনের জন্য জৈবিক নিয়ন্ত্রণ উপকরণের ব্যবহার বিশেষ করে জৈব চাষীদের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রচলিত রাসায়নিকের তুলনায় এ সকল দ্রব্যাদি পরিবেশ এবং প্রয়োগকারীর জন্য তুলনামূলক ভাবে নিরাপদ। ফসলের বিভিন্ন রোগবালাই বিশেষ করে মাটি বাহিত রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় বাণিজ্যিকভাবে সহজলভ্য জৈব নিয়ন্ত্রক সমূহের উদাহরণ হচ্ছে ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি/হারজিয়েনাম (*Trichoderma viride/harzianum*) এবং গ্লিওক্লেডিয়াম ভাইরেন্স (*Gliocladium virens*) নামক ছত্রাক, স্ট্রেপটোমাইসিস গ্রিসিওভিরিডিস (*Streptomyces griseoviridis*) নামক একটিনোমাইসিটিস, *Bacillus subtilis, Bacillus oryzicola* YC7007, *Bacillus siamensis* YC7012, *Bacillus velezensis* GL6, *Bacillus Cereus* নামক প্রমুখ ব্যাক্টেরিয়া। টমেটোর ব্যাক্টেরিয়াল দাগ দমনে Bacteriophages একটি কার্যকর জৈব নিয়ন্ত্রক। Phages হচ্ছে এক প্রকার ভাইরাস যা বিশেষত ব্যাক্টেরিয়াকে আক্রমণ করে। ফসলের মাটি বাহিত ছত্রাকজনিত রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি/হারজিয়েনাম (*Trichoderma viride/harzianum*) এবং গ্লিওক্লেডিয়াম ভাইরেন্স (*Gliocladium virens*) নামক জৈব নিয়ন্ত্রক সমূহের ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। ফসলের ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া (Bacterial wilt) রোগ দমনের জন্য *Bacillus subtilis, Bacillus oryzicola* YC7007, *Bacillus siamensis* YC7012 এবং *Bacillus velezensis* GL6 নামক জৈব বালাইনাশক ব্যাক্টেরিয়া ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে।

আধুনিক জৈবিক রোগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম হল আড়াআড়ি প্রতিরোধ। এই পদ্ধতিতে ভাইরাস ও ক্ষুদ্র অণুজীবের কিছু অংশ পোষক দেহে সংক্রামিত করা হয়। এটা পোষক দেহকে অধিকতর ক্ষতিকারক জীবাণুর ক্ষতি থেকে সুরক্ষা প্রদান করে যেমন-পেঁপের রিং স্পট, লেবুজাতীয় ফসলের ট্রিসটিজা রোগ ইত্যাদি। বর্ণিত অন্যান্য দমন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সমন্বিতভাবে ব্যবহার করা হলে তা রোগ দমন ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ছত্রাকজনিত রোগ, যেমন-খোল পোড়া রোগ দমনে অনেকগুলি উদ্ভিদজাত পদার্থ পরীক্ষা করা হয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত কিছু উদ্ভিদজাত পদার্থের মধ্যে আছে নিম (*Azadirachta indica, A. Juss*), রসুন (*Allium sativum* Linn.), ইউক্যালিপটাস (*Eucalyptus globulus* Labill.), হলুদ (*Curcuma longa* Linn.), তামাক (*Nicotiana tabacum* Linn.), আদা (*Zingifer officinale* Rosc.) ইত্যাদির নির্যাস। এছাড়া থাইমাস (*Thymus vulgaris* Linn.), ইউক্যালিপটাস (*Eucalyptus globulus* Labill), রুই (*Ruta graveolens* Linn.), লেমন ঘাস (*Cymbopogon flexuosus* (Steud. Wats.) এবং চা গাছের অত্যাবশ্যকীয় তেলসমূহ। নিম গোল্ড @ ২০ মিলি/লিটার (Neem Gold @ 20 ml /L) অথবা নিম এজাল @ ৩ মিলি/লিটার (Neem Azal @ 3ml/L) এর পত্র সংলগ্ন স্থানে প্রয়োগে খোল পড়া রোগ উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে এবং ফলনও বৃদ্ধি পেয়েছে। *Eucalyptus globosus* (5%) এবং *Azadirchta indica* (5%) এর নির্যাস *A. brassicae* Ges *Albugo candida* এর বিরুদ্ধে কার্যকর ছত্রাকনাশক হিসেবে এবং অলটারনারিয়া পোড়া রোগ সহ সাদা মরিচা রোগের প্রাদুর্ভাব উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস করেছে।

ফসলের কৃমিজনিত রোগের জৈবিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

জৈবিক নিয়ন্ত্রণ এজেন্টের দ্বারা কৃমি নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে ভাল বিকল্প উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাসায়নিক বস্তুর অবশিষ্টাংশ কমাতে শাকসবজির কৃমি নিয়ন্ত্রণে জৈব নিয়ন্ত্রিত এজেন্ট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিরাপদ, সহজ এবং সস্তা।

প্রর্বতন

ছত্রাক যেমন- *Paecilomyces lilacinus, Trichoderma viride, T. harzianum, Aspergillus niger,* ইত্যাদি ব্যবহারে গীট কৃমি নিয়ন্ত্রণে এবং কমাতে ভাল ফল পেতে দেখা গিয়েছে। পেসিলোমাইসিস লিলাসিনাস *(Paecilomyces lilacinus)* একটি তন্তুময় সাধারণ মৃতজীবী ছত্রাক যাকে একটি বিস্তৃত আবাসস্থল হতে পৃথক করা হয়েছে এবং তা অনেক ফসলের মূলাঞ্চলে পাওয়া যায়। ক্ষতিকর শিকড়ের গিট সৃষ্টিকারী কৃমি দমনে জৈব নিয়ন্ত্রক হিসেবে এই ছত্রাক আশাপ্রদ ফল প্রদর্শন করেছে। ব্যাক্টেরিয়া *Pasteuria penetrans* দ্বারা গীট কৃমি দমন করা যায়। চিহ্নিত জৈব এজেন্ট প্রবর্তণের মাধ্যমে কৃমির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

অগমেন্টেসন

এটি প্রধানত বালাইয়ের প্রাকৃতিক শত্রুদের সংখ্যার বৃদ্ধি বা সম্পূরক হিসেবে ব্যবহারের একটি উপযুক্ত পদ্ধতি। এই ধরনের জৈব এজেন্টসমূহ মাটি থেকে আলাদা করা, লালন পালন, ব্যাণিজ্যিক উৎপাদনে এবং কার্যকরীভাবে ব্যবহারের জন্য সঠিকভাবে ফরমুলেশন করা হয়।

সংরক্ষণ

কৃমির জৈব নিয়ন্ত্রণ ব্যবহারের সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য হলো মাটিতে প্রাকৃতিক ভাবে উপস্থিত কৃমি বিরোধী প্রাকৃতিক শত্রুদের সংরক্ষণ এবং বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। ইংল্যান্ডের দানাদার শস্যের সিস্ট কৃমি, *Heterodera avenae* নিয়ন্ত্রণে ছোট দানার এক ফসল চাষাবাদের প্রচলন রয়েছে।

রোগ ব্যবস্থাপনার মাইলফলকসমূহ

কৃষকেরা যখন প্রথম গাছপালা লাগানো শুরু করেছিল তখন থেকে রোগ-বালাই আক্রমণের প্রকোপতার কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ ছাড়া কিছুই করার ছিল না। ব্লাইট এবং মিলডিউ রোগের রহস্যময় চেহারা দৃশ্যত কোথা থেকে আসছে তা না জানা এবং রোগের ক্ষতির ব্যাপকতার কারণে দেবতা, বাষ্প, ভূত ইত্যাদি তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে উদ্ভিদ বিজ্ঞানী এবং রসায়নবিদগণ রোগের ক্ষতির পরিমাণ কমানোর জন্য ছত্রাকনাশকের উদ্ভাবন এবং আবিষ্কারের জন্য দীর্ঘ যাত্রা শুরু করেন। ক্যাটো (Cato) ২০০০ সালে গাছকে বিটুমিন এবং সালফারের সাহায্যে ধুমায়িতকরণের কথা উদ্ধৃত করেণ। ফরাসি বিজ্ঞানী প্রিভ্রোস্ট (Prevost) ১৮০৭ সালে গমের বান্ট রোগের বিরুদ্ধে বীজ শোধক হিসেবে কপার সালফেটের ব্যবহারের সুপারিশ করেন এবং সেটি ছিল ছত্রাকনাশক হিসেবে কপার যৌগের কার্যকারিতার প্রথম দৃষ্টান্ত। পরবর্তীকালে ১৮২১-১৮৫১ সালের মধ্যে পাউডারি মিলডিউ রোগের জন্য সালফার একটি কার্যকরী ছত্রাকনাশক হিসেবে আবির্ভূত হয়। আরেক ফরাসি বিজ্ঞানী মিলারডেট (Millardet) ১৮৮২ সালে আঙ্গুলের লতার পাউডারি মিলডিউ নিয়ন্ত্রণের জন্য বোর্দো মিশ্রণ আবিষ্কার করেন। বিউলী (Bewley) ১৯২১ সালে নার্সারি বেডের মাটি কুপিয়ে তার সাথে বাদামী যৌগ মিশিয়ে চারার নেতিয়ে পড়া রোগ দমন ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করেন। সেনফোর্ড (Sanford) ১৯২৬ সালে কানাডায় প্রথম উদ্ভিদ রোগ-জীবাণুর সাথে শত্রুভাবাপন্ন বেসিলাস সাবটিলিস (*Bacillus subtilis*) দিয়ে জৈবিক ব্যবস্থাপনার প্রথম পরীক্ষণ পরিচালনা করেন। ওয়েনডিং (Weindling) ১৯৩২ সালে ট্রাইকোডারমা (Trichoderma) প্রজাতিকে জৈবিক দমনের উপাদান হিসেবে ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান করেন। ওয়ার্কসম্যান এবং সিট্জ (Waksman & Schatz) ১৯৪৩ সালে ব্যাপক বিস্তৃত এন্টিবায়োটিক স্ট্রেপটোমাইসিন (Streptomycin) আবিষ্কার করেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৭৮ সালের মধ্যে হেটেরোসাইক্লিক নাইট্রোজেন যৌগ ক্যাপ্টেন (Captan) এর ছত্রাকনাশক বৈশিষ্ট্য আবিষ্কৃত হয় এবং অন্তর্বাহী ছত্রাকনাশক অক্সানথিন, বেনোমিল (Oxanthin, Benomyl) কুমড়া জাতীয় সবজির পাউডারি মিলডিউ এর বিরুদ্ধে; ওমাইসিটিস (Oomycetes) এর বিরুদ্ধে মেটালেক্সিল (Metalaxyl); ফাইকোমাইসিটিস (Phycomycetes) এর বিরুদ্ধে ফোসিটিল-আল (Fosetyl-Al) কার্যকর কিনা তা পরীক্ষা করা হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে প্রথম স্ট্রবিলুরিণস্ (Strobilurins) (যা কাঠ পঁচা মাশরুম ছত্রাক থেকে আহরণ করা হয়েছিল) ছত্রাকনাশক হিসেবে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে চালু করা হয়েছিল। বিশ্বের বহু বিজ্ঞানী নিরাপদ ছত্রাকনাশক/বালাইনাশকের কথা বলে গিয়েছেন যার ধারাবাহিকতায় জৈব বালাইনাশকের ব্যবহার ব্যাপক হারে শুরু হয়েছে। আমাদের দেশে এর যাত্রা সবে মাত্র শুরু হয়েছে। বেগুনের ঢলে পড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ রোগ যার কার্যকরী দমন ব্যবস্থায় উপকারী নভেল বেসিলাস ব্যবহারে ভাল ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং নিরাপদ সবজির উৎপাদনে জৈব বালাইনাশকের ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই।

ছবি: বামে কন্ট্রোল (যেখানে নভেল বেসিলাস প্রয়োগ করা হয়নি) ডানে ট্রিটেড প্লট (যেখানে নভেল বেসিলাস প্রয়োগ করা হয়েছে), স্থান : ময়ূরখীল, খাগরাছড়ী।

বেগুনের চারা উৎপাদন প্রযুক্তি

মো. আব্দুল্লাহ আল মালেক
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র
বিএআরআই, খাগড়াছড়ি

বেগুনের ফলন, স্থানীয় চাহিদা, রং, আকার ও ধরনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন জাতের বেগুন দেশ জুড়ে চাষ হয়। বেগুন আমাদের দেশসহ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, পাকিস্তান ও চীনে ব্যাপক জনপ্রিয়। কিন্তু বেগুনের ভৌগলিক বিস্তারের ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে পাওয়া যায় না। তবে Zeven and Zhukovsky-এর মতে ভারত উপমহাদেশেই বেগুনের উৎপত্তি। এটি রান্নার পাশাপাশি শিল্পের কাঁচামাল ও আচার তৈরীতে ব্যবহৃত হয় (Singh *et al.* 1963)। Choudhury (1976) এর মতে বেগুন ঔষধি গুণাবলী বহন করে এবং সাদা বেগুন ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী। এই সবজির আশানুরূপ বা উচ্চ ফলনের কয়েকটি পূর্ব শর্তের মাঝে মানসম্পন্ন চারা উৎপাদন অন্যতম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ চারা উৎপাদন স্বীকৃত পেশা হলেও আমাদের দেশে মানসম্পন্ন চারা উৎপাদন অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তাই উৎকৃষ্ট মানের চারা উৎপাদনের জন্য কৃষকের জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি করা জরুরী।

উৎকৃষ্ট চারার বৈশিষ্ট্য

* সুস্থ, সবল ও রোগ বালাই মুক্ত হবে
* চারার আকার স্বাভাবিক, অনধিক ছয় (৬) পাতা যুক্ত
* সুগঠিত গুচ্ছমূল ও সবুজ পাতা, পুরু কান্ড ও সতেজ চেহারা

জাত ও বীজ বাছাই

জাতের গুণাগুন ফসলের বীজের মান নির্ণয়ের প্রধান মাপকাঠি। ভালো জাত ও বিশুদ্ধ বীজের অভাবে কাঙ্খিত ফলন পাওয়া যায় না।

* রোগমুক্ত, দাগ বিহীন, সতেজ ও সজীবতা সম্পন্ন ভালো জাতের বীজ নির্বাচন করতে হবে
* চাষীদের প্রক্রিয়াজাতকরণ যোগ্যতা সম্পন্ন জাত নির্বাচন করা উচিত
* উচ্চ ফলনশীলতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, স্থানীয় জলবায়ু সহনশীল ও উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন জাতের চারা উৎপাদন

বীজ শোধন

বীজের মাধ্যমে বেগুনের অনেক রোগ দেখা দিতে পারে যা চারার গুণাগুন নষ্ট করে। বীজ বপনের পূর্বে বেগুনের বীজকে রাসায়নিক ঔষধ দ্বারা (Carboxin and Thiram) গ্রুপের যেকোন ঔষধ; যেমন- Provax-200 WP, Mapvax 75 WP, VitaFlo 200 FF@ ২ গ্রাম/কেজি) বীজ শোধন করা যেতে পারে।

বীজের হার

এক হেক্টর জমির চারা উৎপাদনের জন্য ২৫০-৩০০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয় (রশিদ, ১৯৯৯)। বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষার মাধ্যমেও বীজের পরিমাণ নির্ধারন করা যায়। Purewal (১৯৭৫) এর মতে বেগুনের গড় অঙ্কুরোদগম ৭৫% থেকে ৮০%। সাধারনত প্রতি গ্রামে বীজের পরিমাণ ২৫০টি

বীজ বপনের সময়

উপযুক্ত আবহাওয়াতে সারা বছরই চারা তৈরী করা যায়। চারা বেশি দিন বীজ তলায় থাকলে চারার গুণগতমান হ্রাস পায়, সে জন্য রোপণের সম্ভাব্য সময় হিসাব করে বীজ বপন করতে হবে।

* চারার বয়স- ২৫-৩০ দিন
* চারা ৪-৬ পাতা বিশিষ্ট হতে হবে
* শীতকালের জন্য সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
* গ্রীষ্মকালে মার্চ মাসে বপন করা উত্তম

বীজতলা তৈরী

চারার পরিমাণের উপর নির্ভর করে বীজতলা তৈরি করতে হবে। চারার পরিমাণ কম হলে কাঠের বা প্লাষ্টিকের ট্রে, পলিথিন ব্যাগ, মাটির টব, গামলায়, থালায় বা কলার খোলেও তৈরি করা যেতে পারে। বীজতলা প্রস্তুতি মাটির ধরনের উপর নির্ভর করে। বাণিজ্যিকভাবে বেগুন চারা উৎপাদন করার জন্য স্থায়ী বীজতলা ব্যবহার করা যেতে পারে। বীজতলার জন্য অবশ্যই উর্বর জমি হতে হবে। মাটির সাথে পঁচা গোবর, কম্পোস্ট, জৈব সার মিশিয়ে ঝুরঝুরে করে তৈরী করে নিতে হবে। বীজ বপনের ৫-৭ দিন পূর্বে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা উচিত।

৩ মিটার X ১ মিটার বীজতলার জন্য প্রয়োজনীয় সার-

পঁচা গোবর বা কম্পোষ্ট	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি
১০ কেজি	৪০ গ্রাম	২০ গ্রাম	১০ গ্রাম

সূত্র ঃ (রহমান, ১৯৯৯)

আদর্শ বীজতলা ৩ মিটার লম্বা ও ১ মিটার চওড়া হয়। কাজের সুবিধার জন্য ১ মিটার চওড়া হওয়া উত্তম। তবে জমির অবস্থা ভেদে দৈর্ঘ্য বাড়ানো যেতে পারে। সব চারা সমভাবে সূর্যের আলো পাওয়ার জন্য উত্তর-দক্ষিণ বরাবর বীজতলা করা ভালো। বীজতলার পরিচর্যার জন্য দুটি বীজতলার মাঝে ৫০-৬০ সেমি ফাঁকা রাখা উচিত। বীজতলার উচ্চতা কমপক্ষে ১৫ সে. মি. হবে।

ছবি ঃ ১ অস্থায়ী বীজতলা

ছবি ঃ ২ স্থায়ী বীজতলা

ছবি ঃ বিভিন্ন রকমের বীজতলা

বীজতলায় সারিতে বীজ বপন করা উত্তম। তবে ছিটিয়েও বীজ বপন করা যায়। ছিটিয়ে বীজ বপনের ক্ষেত্রে উপরের মাটি হালকা সরিয়ে নিয়ে বীজ বপন করে সেই মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বেগুনের বীজ ৬ মি.মি থেকে ১২ মি.মি. গভীরে বপন করতে হবে (T.K. Bose *et al.*, 2002)। বীজ বপনের পর গজানোর পূর্ব পর্যন্ত খড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বীজ মাটির বেশি নিচে চলে গেলে অঙ্কুরোদগম বাধাগ্রস্থ হয়। বীজ বপনের পূর্বে বেগুনের বীজ কয়েক ঘন্টা ভিজিয়ে নিলে অঙ্কুরোদগম দ্রুততর হয়। বীজ বপনের পূর্বে জিবারেলিন দ্বারা ভিজানো হলে চারা দ্রুত গজায়, একই আকারের হয় এবং চারা গজানোর হার বৃদ্ধি করে (Sictal, ১৯৯৬)।

ছবি ঃ সারিতে বীজ বপন ও পরবর্তী কার্যক্রম

ছবি ঃ বীজতলায় খড়ের আচ্ছাদন

বীজ তলার আচ্ছাদন

রোদ ও বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। রোদ থেকে রক্ষার জন্য বাঁশের চাটাই ব্যবহার করা যেতে পারে। অতিরিক্ত বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষার জন্য পলিথিন টানেল ব্যবহার করতে হবে।

চারার যত্ন

বীজ বপনের সময় থেকে ভালো চারা উৎপাদনের জন্য যত্ন নিতে হবে। মাটির আর্দ্রতা বা মাটি শুকিয়ে যাওয়া রোধ করতে বাঁশের চাটাই এর ব্যবস্থা করতে হবে। চারার শিকড় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ার পর চাটাই সরিয়ে নিতে হবে। অতিরিক্ত বৃষ্টি থেকে বীজ তলাকে রক্ষা করতে হবে।

* চারা গজানোর ১০-১২ দিন পর ঘন চারা ফেলে না দিয়ে দ্বিতীয় বীজ তলায় স্থানান্তর করা যেতে পারে (সূত্রঃ কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, ২০১৭)
* চারার বৃদ্ধি কম হলে ১০ লিটার পানিতে ৫ গ্রাম ইউরিয়া সার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে (রহমান, ১৯৯৮)

গোড়া পঁচা ও ঢলে পড়া রোগ বেগুন চারার প্রধান সমস্যা

রোগের লক্ষণ

* চারার কান্ড মাটির কাছাকাছি চিকন হয়ে পঁচে যায়
* চারা নেতিয়ে পড়ে।

সেজন্য বীজ তলায় পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশ ও পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করতে হবে। বীজতলা তৈরীর সময় প্রয়োজন মত কীটনাশক ও ছত্রাক নাশক ব্যবহার করে পোকা ও রোগের আক্রমণ অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব। সম্ভব হলে উপকারী বেসিলাসের সমন্বয়ে EMOs (Effective microbial Organisms) ১০ গ্রাম প্রতি কেজিতে অর্থাত ১% হারে মাটিতে প্রয়োগ করলে ঢলে পড়া রোগ দমনে আশানুরুপ ফলাফল পাওয়া যাবে। পাত্রে বা টবে বীজ বপন করার জন্য সার, স্বয়ংক্রীয় কীটনাশক ও ছত্রাক নাশক মিশ্রিত মাটির পাত্রে বা টবে ভরে বীজ বপন করতে হয়। পাত্রের নিচে বালি বা ইটের ছোট টুকরা দিয়ে অতিরিক্ত পানি বের করার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া কোকোপিট মাটির বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করে সুস্থ-সবল চারা তৈরী করা যায়। আধুনিক এই পদ্ধতিতে কৃষক যে কোন সময় চারা তৈরী করতে পারবে। টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে রোগমুক্ত, সুস্থ, সবল চারা তৈরী করা যায়।

ছবি ঃ কোকোপিট ব্যবহার করে চারা তৈরী

জোড়া কলম পদ্ধতিতে বেগুনের চারা তৈরী

উচ্চতর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন বেগুন গাছের উপর কাঙ্খিত উচ্চ ফলনশীলজাতের বেগুন গাছ জোড়া দেওয়া হয়। যার উপর জোড়া দেওয়া হয় তাকে রুটস্টক বা আদি উপজোড় এবং যাকে জোড়া দেওয়া হয় তাকে সায়ন ব উপজোড় বলা হয়। রুটস্টকের জন্য সাধারণত ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী/সহনশীল ক্ষমতা সম্পন্ন, প্রতিকুল পরিবেশে টিকে থাকতে পারে এবং ফসলের জীবনকাল বৃদ্ধি করে বেগুনের ফলন বৃদ্ধি করতে পারে সে রকম বেগুন জাত বা রুটস্টক নির্বাচন করা হয়।

ভাল রুটস্টক

* বন্য বা তিত বেগুন
* বারি বেগুন ৮

জোড় কলম পদ্ধতির ধাপ সমূহ

* বন্য/তিত বেগুনের চারার বয়স ৪০-৪৫ দিন
* কাঙ্খিত বেগুন চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন

রুটস্টক ২-৩ পাতাসহ মাথার উপরের অংশ কেটে ফেলে কান্ডের কাটা মাথাকে প্রায় ১ সেমি গভীর করে ২ ভাগে লম্বালম্বি কাটতে হবে।

রুটস্টক প্রস্তুতকরণ

কাঙ্খিত বেগুনের চারার বা সায়নের উপরের অংশের প্রায় ৪-৫ সেমি কেটে নিয়ে বড় পাতা ফেলে দিতে হবে। কাটা সায়ন অংশের দুই পাশ থেকে প্রায় ১ সেমি লম্বা "V" অক্ষরের মত কাটতে হবে।

সায়ন প্রস্তুতকরণ

বেগুনের "V" এর ন্যায় মাথাটি (উপজোড়) বন্য বেগুন চারার কাটা স্থানে (আদি জোড়) বসিয়ে দিতে হবে। তারপর বাডিং টেপ, পলিথিন স্ট্রিপ (ফিতা) বা গ্রাফটিং ক্লিপ দিয়ে জোড়াটি ভালভাবে আটকে দিতে হবে।

রুটস্টকে সায়ন স্থাপন এবং গ্রাফটিং ক্লিপ দিয়ে আটকানো

ছবি ঃ জোড় কলম পদ্ধতির ধাপ সমূহ

কলম গাছের পরিচর্যা

পলিথিন ও চট বা কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে ৭ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন ৩-৪ বার পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। জোড়ার স্থানে যেন পানি না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এক সপ্তাহ পর পলিথিন সরিয়ে শুধু চট বা কালো কাপড় দিয়ে ১ সপ্তাহ ঢেকে রাখতে হবে। বৃষ্টি না হলে রাতে খাঁচার আচ্ছাদন খুলে রাখা ভাল।

কলম করার ১৫-২০ দিন পর গাছ মাঠে লাগানোর উপযুক্ত হয়। চারা মাঠে লাগানোর সময় গ্রাফটিং ক্লিপ খুলে দিতে হবে এবং পলিথিনের বাঁধন হলে চারা মাঠে লাগানোর ১৫-২০ দিন পরে খুলে দিতে হবে। জোড়ার নিচ থেকে বন্য বা রুটস্টক বেগুনের গজানো ডালপালা কেটে ফেলতে হবে।

References

Choudhury, B. 1976.Vegetable. 4th edn., National Book Trust, New Delhi, pp. 50-58 Nothmann, J., Rylski, I. and Spigelman, M. 1979. Scientia Hort.II : 217-222

Purewal, S. S. 1975.Vegetable Cultivation in North India, Farm Bull, Indian Council of Agricultural Research. New Delhi. No.36

Si, Y.P., He, W.M. and Chen, D. K. 1996. China Vegetables, No. 2, pp. 22-23, 27

Singh, S., Krishnamurthi, S. and Katyal, S. I. 1963. Fruit Culture in India, Indian Council of Agricultural Research. New Delhi. p. 412

Bose,T. k., Kabir, J., Maity,T. k., Parthasarathy, V. A. and Som, M. G. 2002 Vegetable crops, I: 265-344

Zeven, A.C. and Zhukovsky, P. M. 1975. Dictionary of Cultivated Plants and their Centres of Diversity. Wegeningen, Netherlands. p.219

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই। সপ্তম সংস্করণ, জুন ২০১৭। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর

এ.এফ.এম হাবিবুর রহমান। ১৯৯৮। সবজি ও ফুল উৎপাদন, বিপনন ও ব্যবহার। মিসেস আমিনা খাতুন

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল। ২০১৭। "সবজি ফসলের আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি"। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ

মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ। ১৯৯৯। সবজি বিজ্ঞান। রশিদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা

বেগুন চাষের উৎপাদন প্রযুক্তি

ড. মো. মোক্তাদির আলম
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম-৪৩৩০

ভূমিকা

বেগুন সবজি হিসেবে সুস্বাদু। আমরা বেগুন সবজি হিসাবে খেয়ে থাকি এর পুষ্টিগুণও মন্দ নয়। প্রায় সারা বছরই চাষ করা যায় এই সবজি। আমাদের দেশের প্রায় সব জেলাতেই কমবেশি বেগুনের চাষ করা হয়ে থাকে। এই সবজি চাষাবাদের মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি আর্থিক স্বচ্ছলতা আনা সম্ভব। সঠিক নিয়মে চাষ না করার কারণে অনেক চাষীগণ লোকসান করে থাকেন।

মাটি ও জলবায়ু

আমাদের দেশের সব রকমের মাটিতে বেগুন চাষ করা যায় এবং ভাল ফলনও দিয়ে থাকে। তবে পানি নিস্কাশনের সুব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। দো-আঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটিই এর চাষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। বেগুনের জন্য দীর্ঘ লম্বা সময়ব্যাপী নিম্ন তাপমাত্রা (১৫-২৫ ডিগ্রি সে.) সবচেয়ে উপযোগী।

চারা রোপণ দূরত্ব

রোপণের দূরত্ব নির্ভর করে জাতের উপর। ছড়ানো জাতের জন্য বেশি দূরত্ব প্রয়োজন হয়, খাড়া জাতের জন্য কম দূরত্ব প্রয়োজন হয়। সাধারনত ৫০ সেমি প্রশস্থ বেডে এক সারিতে চারা রোপণ করা হয়। দুইটি বেডের মাঝে ৫০ সেমি প্রশস্থ নালা থাকবে। সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ১০০ সেমি।

খুটি দেওয়া ও পার্শ্ব কুশি ছাঁটাই করা

গাছে বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঠেকনা দিতে হবে। গাছে ১ম ফুলের ঠিক নিচের কুশিটি ছাড়া সব পার্শ্ব কুশি ছাঁটাই করতে হবে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা

জমিকে প্রয়োজনীয় নিড়ানী দিয়ে আগাছামুক্ত রাখতে হবে। প্রতিটি সেচের পরে মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে মাটিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে। প্রয়োজনীয় নিড়ানী দিলে মাটিতে শিকড়ের বৃদ্ধি ভাল হয়।

ঢলে পড়া রোগ দমনে পরিচর্যা

"বেগুনের ঢলে পড়া রোগ" ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ হলে পাতা নেতিয়ে গাছ ঢলে পড়ে এবং মারা যায়

* রোগ প্রতিরোধক জাত লাগাতে হবে
* উপকারী নভেল এ্যান্টাগোনেস্টিক বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়ার প্রয়োগ করতে হবে
* আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে
* আক্রান্ত জমিতে শস্য পরিক্রমা অনুসরণ করতে হবে

জমি তৈরি ও চারা রোপণ

সাধারণত মাঠের জমি তৈরীর জন্য ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। ৩৫-৪৫ দিন বয়সের চারা রোপণের উপযোগী হয়। এ সময় চারাতে ৫-৬ টি পাতা গজায় এবং চারা প্রায় ১৫ সেমি লম্বা হয়। চারার বয়স একটু বেশী হলেও লাগানো যেতে পারে। প্রয়োজনে দু'মাস পর্যন্ত চারা বীজতলায় রেখে দেওয়া যায়। চারা তোলার সময় যাতে শিকড় নষ্ট না হয় সেজন্য চারা তোলার ১-২ ঘন্টা আগে বীজতলায় পানি দিয়ে মাটি ভিজিয়ে নিতে হবে। চারা রোপণ দূরত্ব, জাত, মাটির উর্বরতা ও উৎপাদন মৌসুমের উপর নির্ভর করে। সাধারণত বড় আকারের বেগুনের জাতের জন্য বিশেষ করে বারি বিটি বেগুন ২ এর ক্ষেত্রে ৯০-১০০ সেমি দূরে সারি করে সারিতে ৮০-১০০ সেমি ব্যবধানে চারা লাগানো যেতে পারে এবং ক্ষুদ্রাকার জাতের ক্ষেত্রে ৭৫ সেমি সারি করে সারিতে ৫০ সেমি ব্যবধানে চারা লাগানো যেতে পারে। জমিতে লাগানোর পর পরই যাতে চারা শুকিয়ে না যায় সে জন্য বিকালের দিকে চারা লাগানো উচিত।

সার প্রয়োগ

বেগুন মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য উপাদান শোষণ করে। এজন্য বেগুনের সন্তোষজনক উৎপাদন সার ব্যতীত সম্ভব নয়। সারের পরিমাণ মাটির উর্বরতা শক্তির উপর নির্ভর করে। বেগুন চাষের জন্য হেক্টর প্রতি সারণীতে বর্ণিত (সারণী-১) পরিমাণে সার সুপারিশ করা যেতে পারে। জমিতে রস না থাকলে সার প্রয়োগের পর পরই সেচ দিতে হবে।

সারণী - ১

সারের নাম	পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	শেষ চাষের সময় (কেজি)	গর্তে প্রয়োগ (কেজি)	চারা লাগানোর ১৫ দিন পর	বাড়ন্ত অবস্থায়	ফুল ধরা আরম্ভ হলে	ফল ধরা আরম্ভহলে	ফল আহরণের সময়
গোবর/কম্পোস্ট	১০,০০০	৫০০০	৫০০০	-	-	-	-	-
ইউরিয়া	৩০০	-	-	৬০ কেজি	৬০ কেজি	৬০ কেজি	৬০ কেজি	৬০ কেজি
টিএসপি	২৫০	১২৫	১২৫	-	-	-	-	-
এমওপি	২০০	-	৫০	৫০ কেজি	-	৫০ কেজি	৫০ কেজি	-
জিপসাম	১০০	সব	-	-	-	-	-	-
বোরিক এসিড (বোরন)	১০	সব	-	-	-	-	-	-

পোকামাকড় ও দমন ব্যবস্থাপনা

বিভিন্ন প্রকার পোকা ও মাকড় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেগুন উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে। এদের মধ্যে সাদামাছি, এফিড, থ্রিপস, পাতার হপার পোকা, কাঁটালে পোকা এবং মাকড় অন্যতম। বেগুনের সবচেয়ে ক্ষতিকারক বালাইয়ের মধ্যে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা অন্যতম। ক্ষতিকর পোকা ব্যবস্থাপনার জন্য অতীতে শুধু রাসায়নিক ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল। তাই বালাইনাশকের উপর্যুপরি ব্যবহারের ফলে অনেক অপ্রধান ক্ষতিকর পোকা প্রধান ক্ষতিকর পোকায় পরিণত হচ্ছে এবং প্রধান ক্ষতিকর পোকার দেহে কীটনাশকের প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হচ্ছে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, উৎপাদন খরচ বাড়ছে, মাটির উর্বরতা ও ফলন কমছে। জৈবিক দমনের মাধ্যমে শুধু নির্বাচিত ক্ষতিকর পোকা ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয় এবং কোনো পোকার মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতাও উৎপন্ন করে না। জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি একটি পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ পদ্ধতি। ইতোমধ্যে আমাদের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ফসলের কার্যকর জৈবিক দমন ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করেছেন এবং কাজে লাগিয়ে সফলতাও পেয়েছেন। ফসলের মারাত্মক সমস্যার মধ্যে বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা একটি। এটি দমনে জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কৌশল সমূহ নিয়ে বর্ননা করা হলো।

ক) সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বা গন্ধফাঁদের ব্যবহার

সেক্স ফেরোমন হচ্ছে এক ধরনের প্রাকৃতিক রাসায়নিক পদার্থ (বিশেষ ধরণের ঘ্রাণ) যা পরুষ পোকাকে আকৃষ্ট করে। সাধারণত ২ থেকে ৪ ধরনের রাসায়নিক উপাদান সমূহের সংমিশ্রণে সেক্স ফেরোমন গঠিত। সেক্স ফেরোমন ব্যবহারের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এটি প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত যা মানুষ বা পরিবেশের কোনরূপ ক্ষতি করে না। সুতরাং এটি হচ্ছে পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থাপনা। অন্যান্য মথ জাতীয় পোকার মতো বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার সেক্স ফেরোমন দুটি যৌগিক পদার্থ যেমন- ই-১১-হেক্স ডেসিনাইল এসিটেট এবং ই-১১-হেক্সডিসেন-১ ও এল (E-11- hexadecenyl acetate and E-11-hexadecen-1-ol) সমন্বয়ে গঠিত। এ যৌগ দুটির ১০০ঃ১ অনুপাতে মিশ্রণ সর্বাধিক সংখ্যক পুরুষ মথ আকৃষ্ট করতে সক্ষম। ক্ষতিকারক পোকা ব্যবস্থাপনার জন্য সাধারণত ৩টি উপাদানের প্রয়োজন হয় যেমন- সেক্স ফেরোমন টোপ, একটি ফাঁদ এবং ফাঁদটি মাঠে স্থাপনের জন্য ১-২ খুঁটি প্রয়োজন হয়।

ফাঁদ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে

* পোকার উপস্থিতি মনিটরিং বা পর্যবেক্ষণ করা
* অধিক হারে পোকা আটকানো
* পোকার প্রজনন কাজে বাধার সৃষ্টি করা

ফেরোমন ফাঁদ বা পানি ফাঁদ বা জাদুর ফাঁদ তৈরির পদ্ধতি

প্রথমত

প্রায় ৩ লিটার পানি ধারণ ক্ষমতাযুক্ত ২২ সেমি লম্বা গোলাকার বা চার কোণ বিশিষ্ট প্লাস্টিকের পাত্র বা বৈয়ামের উভয় পাশে পাত্রের নিচ বা তলা হতে ৪-৫ সেন্টিমিটার উঁচুতে ত্রিভূজাকারে কেটে ফেলতে হবে। ত্রিভূজের নিচের বাহু সাধারণত ১০ থেকে ১২ সেমি এবং উচ্চতা ১১-১২ সেমি হওয়া ভালো।

দ্বিতীয়ত

সাবান মিশ্রিত পানি সব সময় পাত্রের তলা থেকে ওপরের দিকে কমপক্ষে ৩-৪ সেমি পর্যন্ত রাখা দরকার। পাত্রের ঢাকনার মাঝে কালো রঙের একটি ল্যুপ বসানো থাকে। ল্যুপের নিচের ছিদ্রে তার বাধা হয়। তারের অপর মাথায় ফেরোমন সংবলিত টিউব বা লিউর এমনভাবে বাধতে হবে যেন লিউরটি সাবান মিশ্রিত পানি থেকে ২-৩ সেমি ওপরে থাকে। সতর্ক থাকতে হবে যেন পাত্রের তলায় রাখা সাবান পানি শুকিয়ে না যায় এবং লিউরটি কোনোভাবেই সাবান পানিতে ভিজে না যায়। যত্নের সাথে ব্যবহার করলে একটি পাত্র ২-৩ মৌসুম পর্যন্ত চলতে পারে। কাটা ফাঁকা অংশ উত্তরে-দক্ষিণে স্থাপন করতে হবে যেন বাতাস চলাচলে সুবিধা হয়। গাছ থেকে ফাঁদ ৬ ইঞ্চি ওপরে লাগাতে হবে। গাছ বাড়ার সাথে সাথে এটি ৬ ইঞ্চি দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। সাবান পানি ২-৩ দিন পরপর বদলাতে হবে। প্রতি ৩ মাস পরপর লিউর বদলাতে হবে। আর এ কাজটি চারা লাগানোর দেড় মাসের মধ্যে জমিতে স্থাপন করতে হবে। অনেকে অবশ্য পোকা আক্রমণ করার পর জমিতে স্থাপন করেন, যা ঠিক না।

জমিতে ফাঁদ স্থাপনের সময় ও কৌশল

বেগুন ফসলের জমিতে সাধারণত চারা রোপণের ৪-৫ সপ্তাহ পর থেকেই বেগুনের কচি ডগায় ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ শুরু হয়। তাই ফসলের এ পর্যায় হতেই ফাঁদ স্থাপন করা আবশ্যক। সাধারণত অন্য বেগুনের জমি বা আশপাশের পুরনো শুকনা বেগুন গাছের স্তুপ থেকে পোকার মথ জমিতে আসে এবং পরে ডগা ও ফলে বংশবৃদ্ধি করে। সে কারণে পোকা সফলভাবে দমন করার জন্য শেষবার ফসল সংগ্রহ করা পর্যন্ত ফেরোমন ফাঁদ জমিতে রাখতে হবে। প্রতি ৩ শতকের জন্য একটি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করতে হবে।

ফাঁদ ও টোপ পরিবর্তনের সময়

পানি ফাঁদ সহজে নষ্ট হয় না। সাবধানতা ও যত্নের সাথে ব্যবহার করলে এ ধরনের একটি ফাঁদ ২-৩ মৌসুম পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। অতিরিক্ত বৃষ্টি, রোদ বা বাতাসে ফাঁদ নষ্ট হতে পারে। সেক্ষেত্রে দেরি না করে জমিতে নতুন ফাঁদ স্থাপন করতে হবে। বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার জন্য ব্যবহৃত অধিকাংশ ফেরোমন টিউব/টোপ/ লিউর এ সাধারণত ৩ মিলিগ্রাম পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থ থাকে। এসব টোপ দেড় থেকে ২-৩ মাস কার্যক্ষম থাকে, সেজন্য ২ থেকে ৩ মাস পর টোপ পরিবর্তন করা দরকার। একটি বেগুন মৌসুমে প্রায় ২টি টোপ প্রয়োজন হয়।

ফাঁদ জমিতে স্থাপনের পর করণীয়

❖ প্রতিদিন ফাঁদ পর্যবেক্ষণ করতে হবে
❖ প্রতিদিন ফাঁদের পানি পরীক্ষা করে মরে থাকা পোকা ফাঁদের পানি থেকে আঙ্গুল/কাঠি দিয়ে সরিয়ে ফেলতে হবে
❖ ২-৩ দিন পর পর সাবানের পানি পাল্টে দিতে হবে
❖ সাবান পানির স্তর সব সময় ৩-৪ সেমি যাতে থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে
❖ ফাটা বা ছিদ্রযুক্ত ফাঁদ পাল্টিয়ে নুতন ফাঁদ প্রতিস্থাপন করতে হবে

- ❖ গাছের বাড়ন্ত অবস্থার সাথে তাল রেখে ফাঁদটিকেও ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে তুলতে হবে
- ❖ নির্দিষ্ট সময়ান্তে লিউর বা টোপ পরিবর্তন করতে হবে
- ❖ লিউর স্থাপনের সময় লিউরটির মুখ কোনোভাবেই খোলা যাবে না

উপকারী ব্যাক্টেরিয়ার প্রয়োগ

উপকারী বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়ার প্রয়োগের মাধ্যমে গাছের ক্যামেলেক্সিন বাড়ানো যায়। আবার ব্যাক্টেরিয়ার প্রয়োগের ফলে গাছে রস (ROS- Reactive oxygen Species) প্রবৃদ্ধ হওয়ায় পোকা ও ক্ষতিকর জীবাণু গাছে আসতে নিরুৎসাহিত হয় এবং চলে যায়। সুতরাং কার্যকরী রস প্রবৃদ্ধ হওয়ার জন্য EMOs (Effective Microbial Organisms) গাছের রাইজোস্পিয়ার (Rhizosphere) এর উপরিভাগে মালচিং (Mulching) করে দিয়ে গাছকে সতেজ এবং রোগ-জীবাণু হতে ভাল রাখা যায়।

ফল সংগ্রহ ও ফলন

ফল সম্পূর্ণ পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই সংগ্রহ করতে হবে। ফল যখন পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় অথচ বীজ শক্ত হয় না তখন ফল সংগ্রহ করার উপযুক্ত হয়। সংগ্রহের সময় ফলের ত্বক উজ্জ্বল ও চকচকে থাকবে। অধিক পরিপক্ক হলে ফল সবুজাভ হলুদ অথবা তামাটে রং ধারণ করে এবং শাঁস শক্ত ও স্পঞ্জের মত হয়ে যায়। অনেকে হাতের আঙুলের চাপ দিয়ে ফল সংগ্রহের উপযুক্ত কিনা তা নির্ধারণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে দুই আঙুলের সাহায্যে চাপ দিলে যদি বসে যায় এবং চাপ তুলে নিলে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে তবে বুঝতে হবে বেগুন কচি রয়েছে আর চাপ দিলে যদি নরম অনুভূত হয়, অথচ বসবে না এবং আঙ্গুলের ছাপ থাকে তাহলে বুঝতে হবে সংগ্রহের উপযুক্ত হয়েছে। বেশী কচি অবস্থায় ফল সিকি ভাগ সংগ্রহ করলে ফলের গুণ ভাল থাকে, তবে ফলন কম পাওয়া যায়। ফলের বৃদ্ধি থেকে শুরু করে পরিপক্ক পর্যায়ের কাছাকাছি পৌঁছানো পর্যন্ত-বেগুন খাওয়ার উপযুক্ত থাকে। সাধারণতঃ ফুল ফোটার পর ফল পেতে গড়ে প্রায় ১ মাস সময় লাগে। জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ১৭-৬৪ টন ফলন পাওয়া যায়।

অথ্যসূত্র

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই। সপ্তম সংস্করণ, জুন ২০১৭। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর

এ.এফ.এম হাবিবুর রহমান। ১৯৯৮। সবজি ও ফুল উৎপাদন, বিপনন ও ব্যবহার। মিসেস আমিনা খাতুন

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ২০১৭। "সবজি ফসলের আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি"। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ

মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ। ১৯৯৯। সবজি বিজ্ঞান। রশিদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা

বেগুনের জাত পরিচিতি

ড. এস, এম, ফয়সল
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
পাহাড়াঞ্চল কৃষি গবেষণা কেন্দ্র
রামগড়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

বেগুন বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় সবজি। সারা বছরই এর চাষ করা যায়। তবে শীত মৌসুমে ফলন বেশী হয়। এ দেশে বহু জাতের স্থানীয় বেগুন রয়েছে।

বেগুনের জাতসমূহ

বারি বেগুন-১ (উত্তরা)

'বারি বেগুন-১' জাতটি ১৯৮৫ সালে উত্তরা নামে অনুমোদন করা হয়। এ জাতের গাছ খাটো ও ছড়ানো। পাতা ও শাখার রং হালকা বেগুনী। ফল সরু ও লম্বা ১৮-২০ সেমি, ত্বক পাতলা, শাঁস নরম। চারা রোপণেরে ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ শুরু হয় এবং ৩-৪ মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়। প্রতিটি গাছে ১০০-১৫০ টি ফল ধরে। গাছে গুচ্ছাকারে ফল ধরে। উত্তরা জাতটি ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগের প্রতি সহনশীল। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ৬০-৬৫ টন হয়।

বারি বেগুন-২ (তারাপুরী)

'বারি বেগুন-২' একটি উচ্চ ফলনশীল সংকর জাত। ১৯৯২ সালে জাতটি তারাপুরী নামে অনুমোদিত হয়। ফল কালচে বেগুনী রঙের এবং বেলুনাকৃতির। ফলের ত্বক পাতলা, শাঁস নরম। গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ৬৫-৭৫ টি। জাতটি ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ৭০-৭৫ টন হয়।

বারি বেগুন-৪ (কাজলা)

সংকরায়ণ ও পরবর্তী সময়ে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি বেগুন-৪' জাতটি ১৯৯৮ সালে কাজলা নামে অনুমোদন করা হয়। উচ্চ ফলনশীল এ জাতের ফলের আকার মাঝারী লম্বা, রং কালচে বেগুনী ও চকচকে। কাজলা জাতের গাছের আকৃতি মাঝারী ছড়ানো। গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ৭০-৮০ টি। প্রতি ফলের ওজন ৫৫-৬০ গ্রাম। কাজলা বেগুনের ফলন হেক্টর প্রতি ৫৫-৬০ টন হয়। এই জাতটি ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সংবেদনশীল।

বারি বেগুন-৫ (নয়নতারা)

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি বেগুন-৫' জাতটি ১৯৯৮ সালে 'নয়নতারা' নামে অনুমোদন করা হয়। এ জাত উচ্চ ফলনশীল। এ জাতটির গাছ খাড়া আকৃতির। ফল গোলাকৃতি, রং উজ্জ্বল কালচে বেগুনী। গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ৩৫-৪০ টি এবং প্রতিটি ফলের ওজন ১২০-১৩০ গ্রাম। এ জাতটি অন্যান্য জাতের তুলনায় আগাম ফলন দেয়। ফলন ৪০-৫০ টন/হেক্টর। জাতটি ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সংবেদনশীল।

বারি বেগুন-৬

এ জাতটির গাছ মাঝারী আকৃতির ঝোপালো। হালকা সবুজ রঙের ফল ডিম্বাকৃতির ও গাছ প্রতি গড় ফল সংখ্যা ১৫ টি, লম্বায় ৮-৯ সেমি এবং ব্যাস ৭-৮ সেমি। প্রতি ফলের গড় ওজন ২২৫-২৫০ গ্রাম। ফলন ৪৫-৫০ টন/হেক্টর (শীতকালে), ২৫ টন/হেক্টর (গ্রীষ্মকালে)। এ জাতের বেগুন ঢলে পড়া রোগ, কৃমি রোগ এবং ফল-কান্ড ছিদ্রকারী পোকা ও জ্যাসিড পোকার প্রতি সহনশীল।

কৃষিতে বেসিলাস

বারি বেগুন-৭

উচ্চ ফলনশীল এ জাতটির গাছ খাড়া আকৃতির। ফলের আকার লম্বা, চিকন এবং রং চকচকে গাঢ় বেগুনী। গাছ প্রতি গড় ফল সংখ্যা ৩০-৩৫ টি ও ফল লম্বায় ২০-২৫ সেমি। প্রতি ফলের গড় ওজন ৮০-৯০ গ্রাম। সারা বছর চাষ করা যায় তবে শীতকাল এ জাতটির প্রকৃত মৌসুম। বীজ বপনের ৯০-১০০ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহ করা যায়। ফলন ৪০-৪৫ টন/হেক্টর (শীতকালে), ২৫ টন/হেক্টর (গ্রীষ্মকালে)। এ জাতটি ঢলে পড়া রোগে কিছুটা সহনশীল

বারি বেগুন-৮

উচ্চ ফলনশীল গ্রীষ্মকালীন এ জাতটির গাছ খাড়া আকৃতির। ফলের আকার লম্বাকৃতি, চিকন এবং রং উজ্জ্বল কালচে বেগুনী। গাছপ্রতি গড় ফল সংখ্যা ২০-২৫ টি ও লম্বায় ১৮-২০ সেমি। প্রতি ফলের গড় ওজন ৭০-৮০ গ্রাম। ফলন ৩০-৩২ টন/হেক্টর। জাতটি ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া ও কৃমি রোগ প্রতিরোধী।

বারি বেগুন-৯

এ জাতটির গাছ মাঝারী আকৃতির, ঝোপাল ও কিছুটা খাঁজকাটা পাতা বিশিষ্ট। ডিম্বাকৃতির ও উজ্জ্বল সবুজ রঙের। ফলের নিচের অংশে সাদা সাদা লম্বাটে দাগ থাকে। প্রতি গাছে গড় ফল সংখ্যা ৩০-৩৫ টি এবং ফলের গড় ওজন ৯০-১০০ গ্রাম। ফলন প্রতি হেক্টরে ৫০-৫৫ টন। এ জাতের বেগুন ঢলে পড়া, কৃমি ও শিকড় পচা রোগ সহনশীল।

বারি বেগুন-১০

এ জাতটির গাছ মাঝারী আকৃতির ঝোপালো। ফলের রং উজ্জ্বল গাঢ় বেগুনী এবং লম্বা নলাকৃতির। তাপ সহিষ্ণু হওয়ায় সারা বছর চাষ করা যায়। তবে শীতকালে ভাল ফলন হয়। প্রতি হেক্টরে ফলন ৫৫ টন। গ্রীষ্মকালে ফলন ২৫-৩০ টন। জাতটি ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া প্রতিরোধী।

বারি হাইব্রিড বেগুন-৩

'বারি হাইব্রিড বেগুন-৩' জাতটি বাংলাদেশে শীতকালে চাষাবাদের উপযোগী। এ জাতটি বাংলাদেশের সব ধরনের মাটিতে ও জলবায়ুতে চাষ করা যায়। এ জাতটির গাছ মাঝারী আকৃতির, ঝোপালো ও খাঁজকাটা পাতা বিশিষ্ট। প্রতি গাছে গড় ফল সংখ্যা ৬০-৭০ এবং ফলের গড় ওজন ৯০-১১০ গ্রাম। গড় ফলন ৬৫-৭০ টন/হেক্টর। এ জাতটি ঢলে পড়া রোগে সহনশীল

বারি হাইব্রিড বেগুন-৪

এ জাতটির গাছ মাঝারী আকৃতির এবং ঝোপালো আকৃতির। 'বারি হাইব্রিড বেগুন-৪' বাংলাদেশে শীতকালে চাষাবাদ উপযোগী। ফল হালকা সবুজ ও ডিম্বাকৃতির। গাছ প্রতি গড় ফল সংখা ৩৫-৪০ এবং ফলের গড় ওজন ১২০-১৩০ গ্রাম। গড় ফলন ৫৫-৬০ টন/হেক্টর। এ জাতটি ঢলে পড়া রোগে সহনশীল।

বেগুনের ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী জাত উন্নয়ন প্রযুক্তি

মো. গোলাম আজম
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (উদ্ভিদ প্রজনন)
কৃষি গবেষণা কেন্দ্র
খুলশী, চট্টগ্রাম

ভূমিকা

বেগুন সোলানেসি গোত্রের এক প্রকারের ফল যা আমাদের দেশে সবজি হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত। বেগুন অত্যন্ত রুচিশীল, সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর সবজি। নামে গুণহীনতা পরিচয় থাকলেও অন্য সবজির তুলনায় এটি পুষ্টিতে সমৃদ্ধ। চর্বি বা স্নেহজাতীয় পদার্থের প্রথম, ভিটামিন বি২ (রিবোফ্লাবিন) ধারণে দ্বিতীয় এবং আমিষে বেগুনের অবস্থান তৃতীয়। তাই পুষ্টিগত উৎপাদনের বিবেচনায় বেগুনের গুরুত্ব মোটেই কম নয়। বেগুন ভর্তা, বেগুন পোড়া এবং বেগুনী বানাতে এর ব্যবহার রয়েছে। বিশেষত বাংলাদেশে ইফতারের জন্য বেগুনী একটি জনপ্রিয় খাবার। বেগুন এর ভর্তা অনেক জনপ্রিয়। এটি গ্রাম বাংলার অনেক সুস্বাদু খাবার।

বেগুন উৎপাদনে মাঠ পর্যায়ে ঢলে পড়া রোগটি ক্যান্সারের মতো প্রভাব বিস্তার করে। ফলে কৃষকেরা প্রতি বছর মারাত্মক অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। ঢলে পড়া রোগটি মূলত মাটি বাহিত ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক এমনকি নেমাটোড বা কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। স্যাঁতসেঁতে মাটি ও আর্দ্র আবহাওয়া ঢলে পড়া রোগের জন্য সহায়ক। রোগটি মাটি বাহিত হওয়ার ফলে ঢলে পড়া রোগ নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন। ব্রিডিং প্রক্রিয়ায় উন্নত রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে বেগুনের ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। ব্যাকক্রস মেথড ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Back Cross and Genetic Engineering Method) এর মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

একজন প্লান্ট ব্রিডার জেনেটিক রিসোর্চ বা জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করার মাধ্যমে উদ্ভিদের উন্নয়ন করে থাকেন। সংগৃহীত ওয়াইল্ড রিলেটিভস যা সাধারণত রোগ প্রতিরোধী যেগুলোকে ব্রিডিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে মাদার প্লান্ট হিসেবে ব্যবহার করে রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করা হয়।

F_1 জেনারেশনকে তার মায়েদের সাথে ক্রস করাকে ব্যাকক্রস মেথড বলে। এই মেথডে সাধারণত রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করা হয়।

১ম বছর		রোগ প্রতিরোধী জাত (ক)	X	ফলনশীল প্রচলিত জাত (খ)
		RR		rr
২য় বছর (F_1 কে (খ) এর সাথে ব্যাকক্রস করা হয়েছে)	F_1	Rr(৫০% জিন প্রচলিত জাত খ থেকে)	X	rr
৩য় বছর (Rr কে (খ) এর সাথে ব্যাকক্রস করা হয়েছে)	প্রথম ব্যাকক্রস	Rr (৭৫% জিন প্রচলিত জাত খ থেকে)	X	rr
৪র্থ বছর (Rr কে (খ) এর সাথে ব্যাকক্রস করা হয়েছে)	দ্বিতীয় ব্যাকক্রস	Rr (৮৭.৫ % জিন প্রচলিত জাত খ থেকে)	X	rr
৫ম বছর (Rr কে (খ) এর সাথে ব্যাকক্রস করা হয়েছে)	তৃতীয় ব্যাকক্রস	Rr (৯৩.৭৫ % জিন প্রচলিত জাত খ থেকে)	X	rr
৬ষ্ঠ বছর (Rr কে (খ) এর সাথে ব্যাকক্রস করা হয়েছে)	চতুর্থ ব্যাকক্রস	Rr (৯৬.৮৭৫% জিন প্রচলিত জাত খ থেকে)	X	rr
৭ম বছর (Rr কে (খ) এর সাথে ব্যাকক্রস করা হয়েছে)	পঞ্চম ব্যাকক্রস	Rr (৯৮.৮৮ % জিন প্রচলিত জাত খ থেকে)	X	rr
৮ম বছর (Rr কে সেলফিং করা হয়েছে)	সেলফিং	Rr (৯৯.৪৪ % জিন প্রচলিত জাত খ থেকে)	X	Rr
		Rr		

Rr (প্লান্ট যেটি রোগ প্রতিরোধী ও প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল জাতের গুণাগুন সম্পন্ন)

এভাবে ব্যাকক্রস পদ্ধতিতে রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করা যায়। কিন্তু এটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বল্প সময়ে রোগ প্রতিরোধী জাত উৎপাদন করা সম্ভব। প্লান্ট ব্রিডিং পদ্ধতি ব্যবহার করে কাছাকাছি সম্পর্কযুক্ত প্রজাতির উদ্ভিদের মধ্যে জিন স্থানান্তর করা সম্ভব। কিন্তু অনেক দূর সম্পর্কিত উদ্ভিদে প্রয়োজনীয় জিন প্রবেশ করানো যায় না। আবার গতানুগতিক প্রজননের (Traditional breeding) ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা যায় যেমন- কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যের সাথে অনাকাঙ্খিত বৈশিষ্ট্য গাছের মধ্যে চলে আসে তা সহজে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতি ব্যবহার করে দূর করা যায়।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ (Recombinant DNA) / জিন ক্লোনিং (Gene Cloning) পদ্ধতি ও বলা হয়। এই অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যকে (জিন) ভেক্টরের মাধ্যমে অন্য একটি উদ্ভিদে প্রবেশ করানো হয় যা সুনির্দিষ্ট এবং বংশানুক্রমিকভাবে স্থানান্তরযোগ্য।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ধাপসমূহ

ধাপ ১ ঃ কাঙ্খিত জিনকে চিহ্নিত ও পৃথকীকরণ (Identification and isolation of desired gene)

প্রজাতির বৈশিষ্ট্য DNA এর জিনের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে। DNA এর যে অংশের মধ্যে সুনির্দিষ্ট এবং বংশানুক্রমিকভাবে স্থানান্তরযোগ্য বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত থাকে তাকে জিন বলে। কাঙ্খিত জিনকে শনাক্ত করা হচ্ছে জিন ক্লোনিং এর প্রাথমিক কাজ। শনাক্তকরণের পর কাঙ্খিত জিনকে উদ্ভিদে প্রবেশ করানোর জন্য আলাদা করতে হয়। এই কাজগুলো করার জন্য বিভিন্ন ধরণের কাটিং এনজাইম (Restriction enzyme), অলিগোনিউক্লিওটাইড সিনথেসাইজার/জিন মেশিন নামক অটোমেটিক মেশিন ব্যবহার করা হয়।

ধাপ ২ ঃ চিহ্নিত জিনকে বাহকে প্রবেশ করানো (Insertion of the gene in a vector)

ডিএনএ অণু (DNA Molecule) যে নিজে নিজে রেপলিকেশান (Autonomous replication) করতে পারে এবং জিন বহন করতে পারে তাকে বাহক (Vector) বলে। প্লাজমিড, ভাইরাস, কসমিড এবং কৃত্রিম ক্রোমোজোম ইত্যাদি হল বাহকের উদাহরন। বাহক কেমন হবে তা নির্ভর করে সাধারণত যে উদ্ভিদে জিন প্রবেশ করানো হবে তার প্রকৃতি এবং যে জিন প্রবেশ করানো হবে তার দৈর্ঘ্যের উপর। একই কাটিং এনজাইম (Restriction enzyme) দিয়ে বাহকের ডিএনএ (DNA) এবং কাঙ্খিত জিনকে কাটা হয় এবং লাইগেজ এনজাইম দিয়ে বাহকের কাটা অংশের সাথে কাঙ্খিত জিনকে জোড়া লাগানো হয়। জোড়া লাগানোর পর যে নতুন জিনের নকশা তৈরী হয়। তাকে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ (Recombinant DNA) বলে।

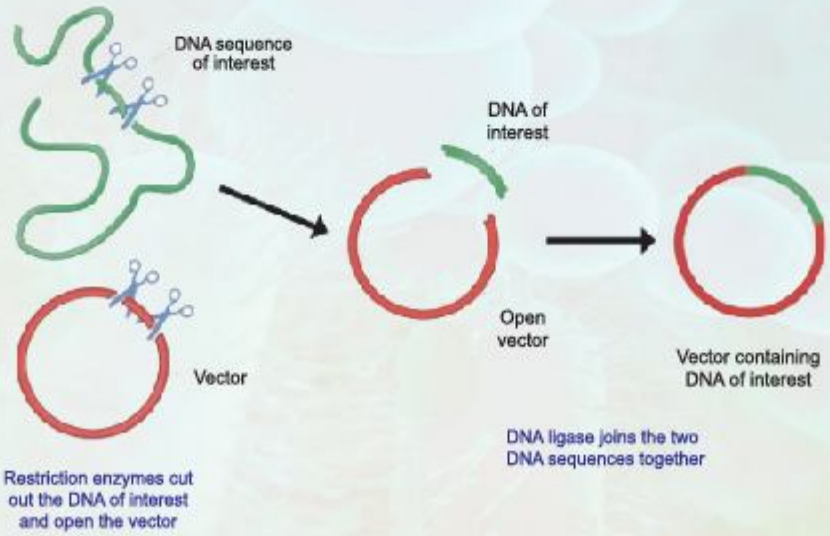

চিত্র: চিহ্নিত জিনকে বাহকে প্রবেশ করানো।

ধাপ ৩ ঃ রিকম্বিনেন্ট ডিএনএকে উপযোগী হোস্টে প্রবেশ করানো ও রুপান্তরিত হোস্ট কোষগুলো শনাক্তকরণ (Introduction of the recombinant DNA into a suitable host and selection of the transformed host cell)

রিকম্বিনেন্ট DNA-কে উপযোগী হোস্টে প্রবেশ করানোকে রুপান্তরকরণ (Transformation) বলা হয়। রিকম্বিনেন্ট DNA কে বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে কোষের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। তার মধ্যে ক্যালসিয়াম আয়ন বা পলিইথিলিন গ্লাইকলের ব্যবহার করা অন্যতম। এছাড়াও জিন গান (Gene gun), এগ্রোব্যাক্টেরিয়াম (Agrobacterium), মাইক্রোফাইবার ও ইলেকট্রোপোরেশান (Electroporation) পদ্ধতি ব্যবহার করে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ-কে কোষের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। উল্লেখ্য, গাছের ক্ষেত্রে দুইটি ভেক্টর ব্যবহৃত হয়; একটি এন্ট্রি ভেক্টর (Entry Vector) অপরটি ডেস্টেনিশান ভেক্টর (Destination Vector) রুপান্তরিত কোষগুলো রিপোর্টার জিন (Reporter gene) ব্যবহার করে শনাক্ত করা হয়। তাছাড়াও ডিএনএ প্রোব্স (DNA probes) ব্যবহার করে কলোনী সংকরায়ণ (Colony hybridization) বা সাউদার্ন ব্লটিং (Southern blotting) এর মাধ্যমেও রুপান্তরিত কোষ শনাক্ত করা যায়। রুপান্তরিত কোষগুলোকে গ্রীনহাউজ (Greenhouse) বা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে (Controlled environment) পরিপূর্ণ উদ্ভিদে পরিণত করা হয়; যেগুলো কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয় যা পরবর্তীতে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। পরবর্তীতে কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত গাছগুলো হতে নমুনা সংগ্রহ করে (Real time PCR/qPCR) কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত জিনের এক্সপ্রেশান দেখে তার সত্যতা পাওয়া যায়। নয়তবা পুরো প্রক্রিয়াটি আবার করতে হবে।

ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী ঃ

* ঢলে পড়া রোগে সংবেদনশীল বা কিছুটা সহনশীল যা কাংখিত ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী নয়; এরূপ জাতসমূহের উন্নয়নে জেনিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। বিভিন্ন গবেষণায় *RRSI/RPS4 (RESISTANT TO RALSTONIA SOLANACEARUM)RE-bw* (*BACTERIAL WILT-RESISTANT), ERS1 (ETHYLENE RESPONSE SENSOR 1*) জিনগুলোকে ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী জিন হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। এই জিনগুলোকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা জিন গানের মাধ্যমে বেগুন গাছে প্রবেশ করিয়ে ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব।

ছবি: ব্যাক্টিরিয়া দ্বারা গাছের ISR Gene প্রবৃদ্ধ করা হয়েছে

তথ্যসূত্রঃ

কৃষি তথ্য সার্ভিস
উইকিপিডিয়া
বি.ডি.সিং এর "প্লান্ট ব্রিডিং" বই

কৃষিতে মলিকুলার প্রযুক্তির প্রয়োগ

ড. মো. ইমরান খান চৌধুরী
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং
বিএআরআই, গাজীপুর

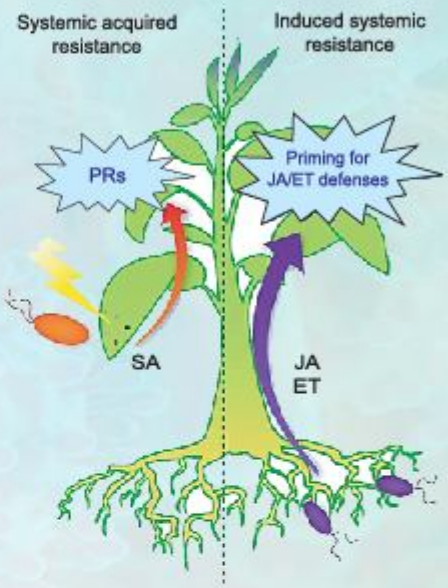

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদার প্রয়োজন মেটাতে আমাদের খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো দরকার। নগরায়নের সাথে সাথে কৃষি জমির সংকোচন, অতিরিক্ত পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার এবং ভূগর্ভস্থ পানির ঘাটতিসহ অন্যান্য পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি ফসলের উৎদনশীলতা হ্রাস এবং টেকসই কৃষির মূল অন্তরায়। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের পাশাপাশি ক্রমহ্রাসমান জমি এবং অন্যান্য পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনা করে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করাই হচ্ছে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের বড় চ্যালেঞ্জ। রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধী, অ্যাবায়োটিক স্ট্রেস (Abiotic Stress) সহনশীল এবং ফসলের অন্যান্য গুনগতমান সম্পন্ন বৈশিষ্ট্যের উন্নয়নের মাধ্যমে উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন ও ফসলের ফলন বৃদ্ধি করা বর্তমান সময়ে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মূল লক্ষ্য। উদ্ভিদ প্রজননে ব্যবহৃত নতুন নতুন কৃষি পণ্য এবং উদ্ভাবিত জাত কৃষি তথা খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে নতুন ভূমিকা পালন করে। ফসলের উৎপাদনশীলতা হ্রাসের সাথে জড়িত উপরোক্ত কারণগুলির অন্যতম রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনে বর্তমান সময়ে জিনগত মলিকুলার প্রযুক্তি কৃষির নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। রোগ প্রতিরোধী ফসলের জাত উদ্ভাবনে বিভিন্ন বায়োলজিক্যাল উৎস হতে প্রাপ্ত কাঙ্খিত জিনের আইসোলেশন, ক্লোনিং এবং তা ফসলে স্থানান্তর ফসলের জিনপুলকে সমৃদ্ধ করে। বিভিন্ন রোগ জীবাণুর হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য উদ্ভিদ প্রকৃতিগতভাবেই নিজস্ব আত্মরক্ষা কৌশল অবলম্বন করে থাকে যা উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নামে পরিচিত এবং তা রোগ প্রতিরোধী জিন Resistance (R) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রতিটি জীবাণুর বিরুদ্ধে উদ্ভিদ প্রজাতিতে বিভিন্ন ধরণের রোগ প্রতিরোধী (R) জিন থাকে এবং উক্ত (R) জিনের বিপরীতে প্রতিটি জিবাণু বা প্যাথোজেন এ অ্যাভিরুলেন্স জিন (avrA) থাকে। উদ্ভিদে ডোমিনেন্ট (R) জিন থাকলে উহার রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা থাকে কিন্তু রিসিসিভ (r) জিন থাকলে উহার রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা থাকেনা। তদ্রুপ জিবাণু বা প্যাথোজেন এর ক্ষেত্রেও অ্যাভিরুলেন্স জিন (avrA) থাকলে তা রোগ সৃষ্টি করতে পারে না তবে ভিরুলেন্স জিন (VirA) থাকলে তা উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। জিনগত মলিকুলার প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট জীবাণু বা রোগের বিরুদ্ধে নতুন রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব। একই প্রজাতির অন্য কোন উদ্ভিদ হতে রোগ প্রতিরোধী কাঙ্খিত (R) জিন নির্দিষ্ট উদ্ভিদে স্থানান্তরের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করা যায় অথবা বাহ্যিক কোন উপায়ে উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধী (R) জিন এর প্রকাশ (expression) বৃদ্ধির মাধ্যমেও উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। বাহ্যিক উপায়গুলির মধ্যে বিভিন্ন জৈবিক এবং অজৈবিক উপাদান বিদ্যমান। অজৈবিক উপাদানের মধ্যে বিভিন্ন কেমিক্যাল বিদ্যমান এবং জৈবিক উপাদানের মধ্যে বিভিন্ন অনুজীব উল্লেখযোগ্য, যেমন বিভিন্ন উপকারী ব্যাক্টেরিয়া এবং ছত্রাক ইত্যাদি। উপকারী ব্যাক্টেরিয়াগুলির মধ্যে বেসিলাস প্রজাতির (*Bacillus* species) ব্যাক্টেরিয়া অন্যতম। এই উপকারী ব্যাক্টেরিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। রাইজোস্পেয়ারে (Rhizospher) প্রায় ৩৫ হাজার প্রজাতির ব্যাক্টেরিয়া থাকে। উপকারী ব্যাক্টেরিয়াগুলো শিকড়ের সাথে আন্তঃভালোবাসায় (Colonization) সিক্ত হয়ে গাছের নানামুখী উপকারে অংশ নেয়। তারা প্রাইম ইনডাকশান (Prime Induction) করে গাছের ইমিউন জিন গুলোকে বাড়িয়ে তোলে যাকে ISR (Induced Systemic Resistance) বলে। এর ফলে গাছে সেলুলার ডিফেন্স কার্যকরী হয়ে ক্যামেলেক্সিন উৎপাদন হয়। ফলে, গাছে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধী ডিফেন্স সৃষ্টি হয়। এই ভাবে উপকারী ব্যাক্টেরিয়াগুলো গাছকে রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে থাকে। qRT-PCR করে তার সত্যতা যাচাই করা যাবে।

বেগুনের প্রধান প্রধান রোগ এবং তার সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

এস এম কামরুল হাসান চৌধুরী
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব)
কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, খুলশী, চট্টগ্রাম

বাংলাদেশে আবাদকৃত সবজি ফসলের মধ্যে বেগুন অত্যান্ত জনপ্রিয় সবজি। ফসলটি রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমে চাষ করা যায়। তবে রবি মৌসুমে ফল ও বীজ উৎপাদনের উপযুক্ত সময় হওয়ায় ফসলটি সারাদেশে ব্যাপকভাবে আবাদ করা হয়। বেগুন উৎপাদনের সময় বিভিন্ন প্রকার রোগের আক্রমণ দেখা যায়। তার মধ্যে কিছু রোগ উল্লেখযোগ্য ক্ষতি সাধন করে থাকে। তাই বেগুনের প্রধান প্রধান রোগের পরিচিতি, লক্ষণ ও তাদের সঠিক দমন ব্যবস্থাপনা জানা দরকার। সঠিক সময়ে এ সকল রোগ দমনের ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে ফলন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। এ সকল রোগের ব্যবস্থাপনায় সঠিক বালাইনাশক নির্বাচন করে নির্দিষ্ট মাত্রায় সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

ছক- ১ বেগুনের প্রধান প্রধান রোগসমুহের কারণ, লক্ষণ, বিস্তার এবং অনুকূল পরিবেশ

ক্রমিক নম্বর	রোগের নাম	রোগের কারণ	জীবানুর নাম	আক্রান্ত অংশ	বিস্তার	অনুকুল পরিবেশ
১।	ড্যাম্পিং অফ	ছত্রাক	*Pythium Phytophthora Phoma, Glomerella Fusarium, Botrytis Phomopsis vexans*	মাটি সংলগ্ন নরম কান্ড	মাটি, আক্রান্ত চারা ও পানি	স্যাঁতসেঁতে মাটি ও মাটির উপরিভাগ শক্ত হলে, চারার ঘনত্ব বেশি হলে, অতিরিক্ত আদ্রতা ও মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া বিরাজ করলে
২।	ফল ও কান্ড পঁচা রোগ	ছত্রাক	*Phomopsis vexans*	পাতা, কান্ড, ফল	মাটি, পানি,বাতাস, ও বীজ, আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ	ছত্রাক বৃদ্ধির অনুকূল তাপমাত্রা ২৯° সে., অতিরিক্ত আর্দ্রতা ও উচ্চ তাপমাত্রা, আদ্রতা আবহাওয়া
৩।	ঢলে পড়া রোগ	ব্যাক্টেরিয়া	*Ralstonia solanacearum*	সম্পূর্ণ গাছ	মাটি, পানি, আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ, বীজ, আগাছা	মাটির উচ্চ তাপমাত্রা ৩৫-৩৭° সে.), মাটিতে অতিরিক্ত রস ও অতিরিক্ত আদ্রতা আবহাওয়া
৪।	শিকড়ে গিট রোগ	কৃমি	*Meloidogyne incognita* and *M. javanica*	মূল	মাটি, পানি ও রোগাক্রান্ত শিকড়	মাটিতে কৃমি থাকলে
৫।	খর্বাকৃতির পাতা রোগ	মলিকিউট	ফাইটোপ্লাজমা	পাতা, কান্ড	সংস্পর্শ ও বাহক পোকা	হপার জাতীয় পোকার উপস্থিতি

১। নেতিয়ে পড়া (Damping Off)

রোগের লক্ষণ

মাটির সংযোগস্থল হতে নিচের দিকে আক্রান্ত চারার কান্ডে প্রথমে পানিভেজা দাগ দেখা যায়। আক্রান্ত অংশ দ্রুত পঁচে যায় এবং হঠাৎ নেতিয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে চারা গাছ মারা যায়।

কৃষিতে বেসিলাস

দমন ব্যবস্থাপনা

- বীজতলার পানি নিস্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকতে হবে ও পাতলা করে বীজ বুনতে হবে
- প্রোভ্যক্স (প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম) নামক ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করা
- বীজতলার মাটি কাঠের গুড়া পোড়ানো বা মুরগীর বিষ্ঠা ব্যবহার বা সরিষার খৈল বা নিমের খৈল প্রয়োগ বা মাটি সোলারাইজেশন বা ট্রাইকো-কম্পোষ্ট ও ট্রাইকো-লিচেট দ্বারা শোধন করা
- আক্রান্ত চারা তুলে নষ্ট করা
- নেতিয়ে পড়া রোগ প্রতিরোধী জাতসমূহের উন্নয়নে জেনিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে
- পাশাপাশি উপকারী নভেল এন্টাগোনেস্টিক আন্ত:কোষীয় (Antagonistic Endophytic) বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে ব্যাক্টেরিয়াল ইনুকুলা (Inocula) যাতে প্রতি এমএল বা গ্রামে $১০^৭$ সিএফইউ থাকে

২। ফল ও কান্ড পচা (Phomopsis Blight)

রোগের লক্ষণ

মাটির সংযোগস্থলে গাছের কান্ড হঠাৎ সরু হয়ে ধূসর রঙের শুকনো পঁচা ক্ষত দেখা যায়। বাকল খুলে যায় ফলে ভিতরের টিস্যু দেখা যায়। ফলের গায়ে বিবর্ণ সানকেন (Sunken) ক্ষত হয়। পরবর্তীতে তা সমস্ত ফলে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত ফল দ্রুত পঁচে যায়। ফলের গায়ে অসংখ্য পিকনিডিয়া পরিলক্ষিত হয়।

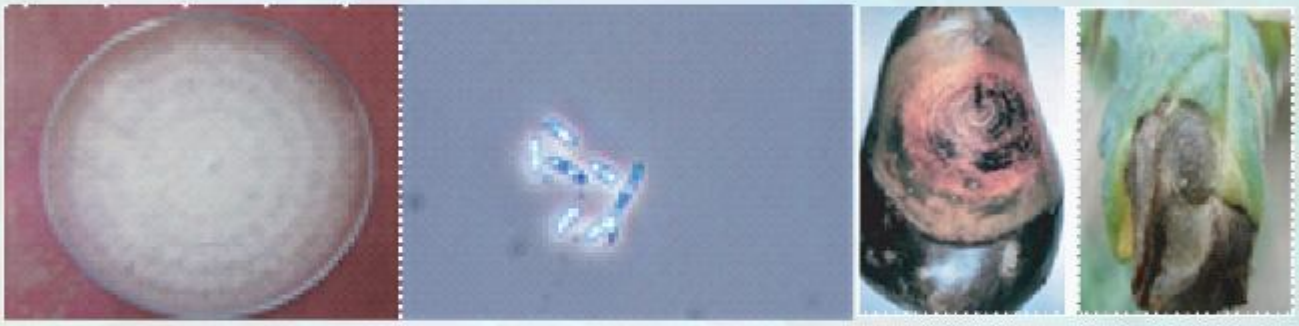

দমন ব্যবস্থাপনা

- সুস্থ ও রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার এবং রোগ প্রতিরোধী জাত আবাদ করা
- চারা লাগানোর তিন সপ্তাহ আগে হেক্টর প্রতি পঁচানো (কমপক্ষে ৬ মাস) মুরগীর বিষ্ঠা ৫ টন বা সরিষার খৈল ৬০০ কেজি বা ট্রাইকো-কম্পোষ্ট ২.৫ টন জমিতে প্রয়োগ করে দমন করা যায়
- ৫০° সে. তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট বীজ শোধন করা
- ১ কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম প্রোভ্যক্স দিয়ে বীজ শোধন করা
- আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ সরিয়ে পুড়ে ফেলা
- ৩-৪ বছর শস্যাবর্তন করা
- আক্রান্ত গাছে ২০ দিন অন্তর দুই বার ০.১% হারে কার্বেনডাজিম স্প্রে করা অর্থাৎ প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম
- ট্রাইকো-লিচেট প্রতি লিটার পানিতে ২০ মিলি মিশিয়ে সবজির বাড়ন্ত অবস্থা থেকে ১০/১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা
- ইপ্রোডিয়ন (রুভরাল) ০.২% হারে পানির সাথে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছে স্প্রে করা

৩। ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া (Bacterial Wilt)

রোগের লক্ষণ

প্রাথমিক অবস্থায় প্রখর রোদে গাছের পাতা নিচের দিকে নুইয়ে পড়ে। রোদের প্রখরতা কমার সাথে সাথে স্বাভাবিক হয়ে যায়। গাছে পুষ্টি ও পানির ঘাটতি দেখা দিলে নতুন পাতা ছোট হয়ে যায় এবং বয়স্ক পাতার কিনারা পুড়ে যায়। পরে আস্তে আস্তে গাছের পাতা ও শাখা-প্রশাখা ঢলে পড়ে এবং গাছ সবুজ অথবা হালকা বিবর্ণ অবস্থায় মারা যায়। আক্রান্ত গাছের কান্ড, শাখা বা পাতার বোঁটা কেটে খাড়া করে পানিতে ডুবিয়ে রাখলে কিছুক্ষণ পর সেগুলো হতে পুঁজের মত সাদা পদার্থ নিঃসৃত হয়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- প্রতিরোধী বা সহনশীল জাত যেমন- বারি বেগুন-৮, বারি বেগুন-১০ প্রভৃতি চাষ করা
- বাদাম, সরিষা, ভূট্টা প্রভৃতি দ্বারা শস্য পর্যায় অবলম্বন করা
- চারা লাগানোর ২ সপ্তাহ আগে হেক্টর প্রতি আধা পঁচা (কমপক্ষে ৬ মাস) মুরগীর বিষ্ঠা ৫ টন বা সরিষার খৈল ৬০০ কেজি বা ট্রাইকো-কম্পোষ্ট ২.৫ টন জমিতে প্রয়োগ করা
- রোগাক্রান্ত গাছ দেখামাত্র গোড়ার মাটিসহ তুলে ফেলা
- রোগাক্রান্ত জমিতে সোলানেসি পরিবারের ফসল চাষ না করা। বীজতলা ও মূল জমি এবং এর আশে পাশের সোলানেসি পরিবারভুক্ত আগাছা মুক্ত রাখা
- আদিজোড় হিসেবে তিত বেগুনের (*Solanum torvum*) বা কাঁটা বেগুন (*Solanum sisymbriifolium*) এর সাথে কাঙ্ক্ষিত জাত গ্রাফটিং করে চাষাবাদ করা
- ৩-৪ ইঞ্চি উঁচু বেড তৈরি করে চারা রোপণ করা। পরিমিত সেচ প্রদান ও অতিরিক্ত পানি নিষ্কাষন করা
- বীজতলা ও মূল জমির মাটি নেমাটোড মুক্ত রাখা এবং নেমাটোড মুক্ত চারা উৎপাদন ও রোপণ করা
- ঢলে পড়া রোগে প্রতিরোধী জাতসমূহের উন্নয়নে জেনিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে
- পাশাপাশি উপকারী নভেল এন্টাগোনেস্টিক আন্তঃকোষীয় (Antagonistic Endophytic) বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, ব্যাক্টেরিয়াল ইনুকুলা (Inocula) যাতে প্রতি এমএল বা গ্রমে $১০^{৯}$ সিএফইউ থাকে

৪। শিকড়ে গিট (Root Knot)

রোগের লক্ষণ

শিকড়ে ছোট ছোট গিট দেখা যায়। সময়ের সাথে সাথে গিটগুলো বড় হয়। রোগাক্রান্ত শিকড়ে সহজেই পঁচন ধরে বিধায় গাছে প্রয়োজনীয় পুষ্টি ঘাটতি হওয়ায় চারাটি খর্বাকার হয় এবং এক পর্যায়ে ঢলে পড়ে। মাটিবাহিত অন্যান্য রোগের প্রকোপ বাড়ে। পরিশেষে গাছ মরেও যেতে পারে।

কৃষিতে বেসিলাস

দমন ব্যবস্থাপনা

- চারা উৎপাদনে বীজ তলায় ৬ সেন্টিমিটার পুরু স্তরে কাঠের গুড়া বিছিয়ে দিয়ে পোড়ালে কৃমি ও অন্যান্য রোগ জীবাণু দমন হয়। বীজ বা চারা লাগানোর ২ সপ্তাহ আগে হেক্টর প্রতি আধা পঁচা (কমপক্ষে ৬ মাস) মুরগীর বিষ্ঠা ৫ টন বা সরিষার খৈল ৬০০ কেজি বা ট্রাইকো- কম্পোষ্ট ২.৫ টন জমিতে প্রয়োগ করে কৃমি দমন করা যায়
- ফুরাডান (কার্বফুরান) হেক্টর প্রতি ২৫ কেজি হারে ব্যবহার করে কৃমি রোগ সহজে দমন করা যায়
- আদিজোড় হিসেবে শিকড়ে গিট রোগ প্রতিরোধী তিত বেগুনের (*Solanum torvum*) সাথে কাঙ্কিত জাত গ্রাফটিং করে চাষাবাদ করা
- এবামেকটিন সমৃদ্ধ বায়োপেস্টিসাইড প্রয়োগে কৃমি দমন করা যায়
- শিকড় গিট প্রতিরোধী জাতসমূহের উন্নয়নে জেনিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।
- পাশাপাশি উপকারী নভেল এন্টাগোনেস্টিক আন্ত:কোষীয় (Endophytic) বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, ব্যাক্টেরিয়াল ইনুকুলা (Inocula) যাতে প্রতি এমএল বা গ্রমে ১০^{৭} সিএফইউ থাকে।

৫। খর্বাকৃতির পাতা (Little Leaf)

রোগের লক্ষণ

আক্রান্ত পাতার আকৃতি খুব ছোট হয়। কান্ডে দুই পাতার মধ্যবর্তী অংশ ছোট হয়ে যাওয়ায় পাতাগুলি গুচ্ছাকৃতির মনে হয়। ফুল পাতার রং ও আকৃতি ধারন করে। প্রাথমিক অবস্থায় এ রোগে আক্রান্ত হলে কোন ফল হয় না। কিন্তু ফল ধারন অবস্থায় আক্রান্ত হলে ফলসমূহ ছোট ও শক্ত হয় যা ভক্ষণযোগ্য নয়।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

- রোগাক্রান্ত গাছ দেখামাত্র তুলে ফেলে ধ্বংস করা
- হপার পোকার উপস্থিতি দেখা দিলে তার নিয়ন্ত্রণে সঠিক ব্যাবস্থা গ্রহণ করা
- বেগুনের ক্ষেত আগাছামুক্ত রাখা

বেগুনের ঢলে পড়া রোগ ও তার দমন ব্যবস্থাপনা

ড. মো. মনিরুল ইসলাম
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

ঢলেপড়া রোগ (wilt) বেগুন, টমেটো, কুমড়া জাতীয় সবজি ও আলুর একটি মারাত্মক ও সাধারণ (common) রোগ।

লক্ষণ (Symptoms)

চারা অবস্থা থেকে গাছের যে কোন বয়সে ঢলে পড়া রোগ দেখা দিতে পারে। ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগে আক্রান্ত হলে গাছ হঠাৎ ঢলে পড়ে। আক্রান্ত গাছ সকালে সুস্থ দেখালেও বিকালে ঢলে পড়ে। এ অবস্থা ২-৩ দিন চলতে থাকে। পরে গাছ শুকিয়ে মারা যায়। কোন কোন সময় আক্রান্ত গাছের নিচের পাতাগুলো কিনারা ঝলসে যেতে পারে। আক্রান্ত ডাল কেটে পরিস্কার পানিতে রাখলে কিছুক্ষণের মধ্যে ঘোলাটে পুঁজ (ooze) বের হয়ে আসে।
ছত্রাকজনিত ঢলে পড়া রোগে আক্রান্ত গাছের পাতা হলদে ভাব ধারণ করে। গাছের এক পাশ ঢলে পড়ে এবং ধীরে ধীরে অন্য পাশ ঢলে পড়ে। চূড়ান্ত-ভাবে সম্পূর্ন গাছটি ঢলে পড়ে এবং শুকিয়ে মরে যায়।
উভয় ক্ষেত্রে vascular bundles বিবর্ণ হয় ও পঁচে যায়। খাদ্য ও পানি চলাচল ব্যাহত হয়। ফলে গাছ ঢলে পড়ে।

কারণ (Causes, Factors)

ব্যাক্টেরিয়া (*Ralstonia solanacearum*) ও ছত্রাক *Fusarium oxysporum* বেগুন ও সবজির ঢলে পড়া রোগ সৃষ্টি করে। ব্যাক্টেরিয়া ও ছত্রাক মৃত্তিকা ও মৃত্তিকাস্থ রোগাক্রান্ত গাছের পঁচা কান্ড ও পাতায় অবস্থান করে। উচ্চ তাপমাত্রা ও অধিক আর্দ্রতা গাছে ঢলে পড়া রোগের আক্রমণের জন্য সহায়ক। সেচ বা বৃষ্টির পানি ও কৃষি যন্ত্রপাতি রোগ ছড়াতে (spread) সাহায্য করে।
ব্যাক্টেরিয়া ৩৫-৩৭° সে. তাপমাত্রায় উপযুক্তভাবে বিকাশ লাভ করে এবং ৩৭° সে. এ সব চেয়ে বেশি আক্রমণ ঘটে, <১৫° সে. এ কোন রোগ সৃষ্টি করে না। মাটির আর্দ্রতা ৫০% এর কম হলে রোগ সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটে । pH ৬.২-৬.৬ অনুকূল হলেও সবচেয়ে বেশি রোগ হয় যখন pH ৭.৪। মাটির Clay পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে রোগ কমে যায়, জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়লে রোগ বেড়ে যাবে যদি উপকারী ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা ভাল ভাবে Mineralization না হয়। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে রোগের তীব্রতা হ্রাস পায়। জমিতে নেমাটোড থাকলে ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ বৃদ্ধি পায়।

রোগ চক্র (Disease Cycle)

জীবাণু (ছত্রাক ও ব্যাক্টেরিয়া) মাটিতে দীর্ঘদিন অবস্থান করে। উপযুক্ত আবহাওয়ায় পোষকের সংস্পর্শে এলে আক্রমণ করে। প্রথমত ছোট ছোট শিকড়গুলোতে নোমটোড-জনিত ক্ষতের ভিতর দিয়ে জীবাণু প্রবেশ করে। পরে মূল শিকড়ে প্রবেশ করে। Vascular bundles পঁচে গেলে পানি ও খাদ্য চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। তখন গাছ ঢলে পড়ে। গাছ মারা গেলে ছত্রাক/ব্যাক্টেরিয়া মাটিতে অবস্থান করে।

দমন ব্যবস্থা (Control measures)

- যে জমিতে ঢলে পড়া রোগ হয় সেখানে বেগুন, টমেটো প্রভৃতি ফসল ২/৩ বছর চাষ না করা ভাল
- জমি তৈরি করার সময় সারের সাথে ১৫-২০ কেজি ফুরাডান / হেক্টর (কার্বোফুরান Carbofuran) মাটির সাথে মিশিয়ে দিলে ব্যাক্টেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগ কম হবে
- জমি তৈরি করার সময় ২০ কেজি/হেক্টর স্ট্যাবল ব্লিচিং পাউডার মাটিতে প্রয়োগ করেও ব্যাক্টেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগ দমন করা যায়
- আক্রান্ত গাছের গোড়ায় ০.২% কুপ্রাভিট (২০ গ্রাম ঔষধ+ ১০ লিটার পানি) স্প্রে করতে হবে
- ছত্রাক জনিত ঢলে পড়া রোগ দেখা দিলে সাথে সাথে আক্রান্ত গাছের গোড়ায় ০.২% অটোস্টিন (Carbendazim) অর্থাৎ ২০ গ্রাম ঔষধ ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে
- ঢলে পড়া রোগে আক্রান্ত গাছ মারা গেলে তা তুলে ফেলে একটি গর্তে রাখতে হবে এবং গর্তটিতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে
- উপকারী ব্যাকটেরিয়া (বেসিলাস/Bacillus) প্রয়োগ করেও এই রোগ দমন করা যায়। জমিতে উপকারী ব্যাকটেরিয়ার পরিমান বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ কমানো সম্ভব
- ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী জাতসমূহের উন্নয়নে জেনিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে কিংবা রেজিসটেন্স জিন এর ইনডাকশান বাড়াতে হবে; অর্থাত গাছে ISR বাড়াতে হবে
- কার্যকরী ব্যাক্টেরিয়ার (EMOs) প্রয়োগ করে ঢলে পড়া রোগ দমন করা সম্ভব
- পাশাপাশি উপকারী নভেল এন্টাগোনেস্টিক আন্ত:কোষীয় (Antagonistic Endophytic) বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে ব্যাক্টেরিয়াল ইনোকুলা (Inocula) যাতে প্রতি এমএল বা গ্রমে $১০^৭$ সিএফইউ থাকে

ছবি: পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগরাছড়ী পার্বত্য জেলা

ঢলে পড়া রোগ নিয়ন্ত্রণে বেগুন চাষে সেচ ব্যবস্থাপনা

মো. পানজারুল হক
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম-৪৩৩০

সেচ

প্রাকৃতিক বৃষ্টিপাত ছাড়া ফসলের জমিতে কৃত্রিম উপায়ে পানি প্রয়োগ করে জমি থেকে অধিক হারে ফসল উৎপাদনই হলো সেচ।

সেচের গুরুত্ব ও বেগুন গাছের সেচ পদ্ধতি

* মাটিকে নরম করে যথাযথভাবে গাছের শিকড় বৃদ্ধি করে
* মাটির অণুজীবকে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সাহায্য করে
* গাছের পানির চাহিদা পূরণ করে এবং প্রস্বেদনে সহায়তা করে
* খরা থেকে গাছকে রক্ষা করে
* মাটিতে বিদ্যমান গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদানকে শিকড়ের মাধ্যমে গ্রহনোপযোগী করে তুলতে সাহায্য করে
* পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ঠান্ডা রেখে পরিবেশের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে

পৃথিবীর পানি সম্পদের অবস্থা

আমরা জানি, ভূ-পৃষ্ঠের ৪ ভাগের ৩ ভাগই জলদ্বারা বেষ্টিত। প্রকৃতপক্ষে স্বাদু পানির পরিমাণ খুবই কম

* ৯৭.৫% ভূ-পৃষ্ঠের পানি লোনা
* প্রায় ২% পানি বরফ এবং তুষার হিসেবে গণ্য
* শতকরা ১ ভাগের কম পানি (০.৭%) স্বাদু যা নদী, খাল, বিল, জলাধার এবং ভূগর্ভে পাওয়া যায়

বাংলাদেশে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহ

* উত্তোলন কমিয়ে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পুনরুদ্ধার করা
* ভূ-উপরিস্থ পানির উৎস/মজুদ বৃদ্ধিকরণ
* মাঠ পর্যায়ে পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ফসল ও পানির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা
* ফসলের প্রকারভেদে দেশব্যাপী অভিন্ন সেচের মূল্য নির্ধারণ
* পরিবর্তিত জলবায়ু মোকাবেলায় মাঠ পর্যায়ে মাইক্রো সেচ পদ্ধতির প্রবর্তন ও উন্নয়ন
* লবণাক্ত ও শহুরে বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনায় গবেষণা জোরদারকরণ
* পাহাড়ী অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন
* ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় গবেষক, সম্প্রসারণকর্মী এবং উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্ঠা অব্যাহত থাকা

সম্ভাব্য করণীয়

* উন্নত পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তিসমূহ কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ
* পানি সংকটপূর্ণ এলাকায় স্বল্প পানিগ্রাহী ফসলের চাষ বৃদ্ধি করা
* বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির মজুদ বৃদ্ধি করা
* মাইক্রো সেচ যেমন ড্রিপ ও স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতি এবং সোলার সেচ পদ্ধতি ভর্তুকির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ
* শস্য ভিত্তিক সেচ পানির মূল্য নির্ধারণে সমতাকরণ
* পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা জোরদারকরণে মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ
* কৃষক পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তিসমূহের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি প্রকৌশল উইংকে জোরদারকরণ

সেচের সাথে উদ্ভিদ রোগের সম্পর্ক (Relation to Irrigation for Disease development)

Café-Filho, ২০১৮ সালে Irrigation in Agroecosystem এর ১২৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, রোগ দমনে তালিকাভুক্ত সেচ পদ্ধতি আক্রান্ত গাছে ব্যবহার করা যাবে না।

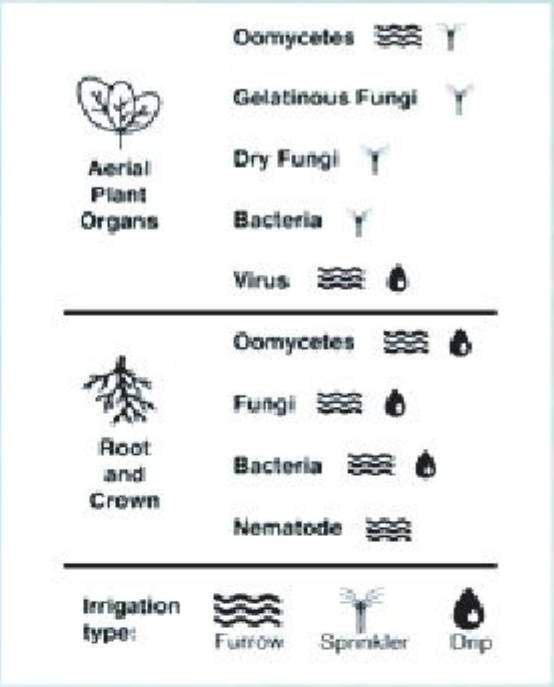

বি:দ্রঃ লিজেন্ডের পাশে বর্ণিত পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করা যাবে না

সেচের তালিকায়ন (Irrigation Scheduling)

সেচের তালিকায়ন বলতে ফসলে কখন বা কি পরিমাণ সেচ দিতে হবে তা বুঝায়। সেচের তালিকায়ন নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

* ফসলের প্রকারভেদ
* শস্য মৌসুম
* ফসলের জীবনকাল
* মাটির প্রকারভেদ
* সেচ পদ্ধতি
* আবহাওয়া

সেচের সংকটকাল (Critical stage)

সেচের সংকটকাল বলতে ফসলের যে বৃদ্ধি পর্যায়ে অবশ্যই গাছের শিকড় অঞ্চলে পরিমিত আদ্রতা থাকতে হবে নতুবা ফলনের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হবে তাকে বোঝায়।

সেচের বিভিন্ন পদ্ধতি

সেচ পদ্ধতিকে প্রধানতঃ চার ভাগে ভাগ করা যায়, ভূ-পৃষ্ঠ সেচ পদ্ধতি (Surface irrigation method), ভূ-গর্ভস্থ সেচ পদ্ধতি (Sub-surface irrigation method), ফোয়ারা সেচ পদ্ধতি (Sprinkler or overhead irrigation method), ও ট্রিকল বা ড্রিপ সেচ পদ্ধতি (Trickle or drip irrigation method)|

ভূ-পৃষ্ঠ সেচ পদ্ধতি (Surface irrigation method)

* জমির উপরিভাগে পানি পৌঁছানোর মাধ্যমে এ পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করা হয়।

কৃষিতে বেসিলাস

নালা পদ্ধতি (Furrow method)

এ পদ্ধতিতে ফসল একটু বেশি দূরত্বে ও লাইনে বপন বা রোপণ করা হয়। ফসলের ভূগর্ভস্থ বিশেষ অংশ পানি সম্পৃক্ততা সহ্য করতে পারে না। এ ধরণের ফসলে (যেমন-আলু, মূলা, সুগারবিট ইত্যাদি) একদিকে ঢালু বিশিষ্ট জমিতে এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ঢালুত্বের দিকে দুই সারির মধ্যবর্তী স্থানে অগভীর নালা তৈরি করে নালার দুই-পার্শ্বের উঁচু আইলে ফসল বপন বা রোপণ করা হয়। জমির ঢালুত্ব ভেদে নালার দৈর্ঘ্য ১০-১০০০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। তবে ঢালুত্ব ৩% এর চেয়ে বেশি হলে এবং ১৫% এর কম হলে নালাগুলো জমির ঢালুত্ব বরাবর না করে কন্টুর পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। জমির ঢালুত্ব ১৫% এর বেশি হলে এ পদ্ধতি আর অবলম্বন করা যায় না। উৎস হতে উঁচু অংশে পানি ছাড়লে নিচু অংশে ক্রমান্বয়ে সেচ হতে থাকে। এ পদ্ধতির দক্ষতা বেশি হলেও নালা তৈরির খরচ বেশি। করুগেশন বা সংকোচন পদ্ধতির সাথে এ পদ্ধতির পার্থক্য এই যে, করুগেশন (Corrugation) বা সংকোচন পদ্ধতির মত এ পদ্ধতিতে দু-নালার মধ্যবর্তী অংশ নালার পানি দ্বারা প্লাবিত হয় না।

সুবিধাসমূহ

* প্লাবন পদ্ধতির চেয়ে সেচের পানি কম লাগে
* পানি নালার মাধ্যমে জমির নীচের অংশে প্রয়োগ করা হয় বলে সমস্ত জমি ভেজানোর দরকার হয় না
* যেসব ফসলের গাছ পানির সম্পৃক্ততা বেশী সময় সহ্য করতে পারে না ঐসব ফসলের গাছের জন্য এ পদ্ধতি উপযোগী
* প্লাবন পদ্ধতির চেয়ে এ পদ্ধতিতে অধিকতর সমভাবে পানির প্রয়োগ হয়ে থাকে

অসুবিধাসমূহ

* জমির ঢালুত্ব ৩ শতাংশের বেশী বা ১৫ শতাংশের কম হলে এ পদ্ধতিতে পানি প্রয়োগ অসুবিধাজনক
* জমিতে নালা বা ফারো তৈরীর কারণে খরচ বেশী হয়

ফোয়ারা সেচ পদ্ধতি (Sprinkler or over head irrigation method)

উপর হতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁটা আকারে বৃষ্টির মত পানি ফসলের জমিতে প্রয়োগ করাকে ফোয়ারা সেচ বলে। জমি উঁচু নিচু হলে, জমির মাটি বেলে প্রকৃতির হলে, পানি খুব দুস্প্রাপ্য হলে অথবা অতিরিক্ত শ্রমিক মজুরি এড়াতে এই সেচ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। বীজতলা, পাহাড়ী অঞ্চলের খুব ঢালু জমিতে এবং ফুলের বাগানের জন্য এ পদ্ধতি খুবই উপযোগী। দু'টি আনুভূমিক নলের (Horizontal pipes) সংযোগ স্থলে রাইজার নলের (Riser pipe) মাথায় নজল (Nozzles) স্থাপন করে পানির ফোয়ারা সৃষ্টি করা হয়। এ নজলকে ঘূর্ণায়মান শীর্ষের (Rotating heads) সাথে যুক্ত করে দিলে তা ঘুরে ঘুরে একটি নির্দিষ্ট বৃত্তে পানি সরবরাহ করে থাকে। সাধারণতঃ ছিদ্র যুক্ত নলের (Perforated pipes) সাথে নজল স্থাপন করে এ পদ্ধতিতে সেচ দেয়ার প্রচলন বেশি দেখা যায়। বহনযোগ্য (Portable), আধাবহন যোগ্য, (Semi portable) ও স্থায়ী এই তিন রকমের ফোয়ারা পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। প্রাথমিক খরচ বেশি হলেও স্থায়ী ফোয়ারার মাধ্যমে পরবর্তী পানি সেচের খরচ খুবই কম। তবে খামারকে কয়েকটি ব্লকে ভাগের মাধ্যমে বহনযোগ্য ফোয়ারা পদ্ধতি ব্যবহার করে জমিতে সেচ প্রদান সুবিধাজনক। মসলা জাতীয় ফসল ও চা বাগানে সেচের জন্য এই পদ্ধতি অধিকতর কার্যকর।

মুক্ত বা বন্যা প্লাবন পদ্ধতি (Free or wild flooding method)

এ পদ্ধতিতে কোন উঁচু উৎস হতে জমিতে প্লাবন আকারে পানি পৌঁছানো হয়। পানির গতি বা দিক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জমিতে কোন আইল বা বাঁধ তৈরি করা হয় না বা নকশাকরণও (Lay out) করা হয় না। সাধারণতঃ পানি সহজে পাওয়া গেলে এবং অতিরিক্ত পানি জমার কারণে ফসল বা মাটির কোন প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকলে এ পদ্ধতি অনুসৃত হয়। এ পদ্ধতিতে পানির অপচয় বেশি হয় এবং জমির সকল অংশে সমভাবে পানি পৌঁছে না। তবে জমি সমান করণ (Levelling) ছাড়া আর কোন খরচ নেই বলে এ পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণতঃ গম, যব, কাউন ইত্যাদিতে এ পদ্ধতি অবলম্বনে সেচ দেয়া হয়।

সুবিধা সমূহ

* পানির প্রবাহকে তেমন নিয়ন্ত্রণ করার দরকার হয় না
* পাইপ অথবা শীর্ষ নালা (Head ditch) থেকে পানি জমিতে ছাড়া হয় বলে দুই ধরনের সুবিধাই পাওয়া যায়
* জমি চওড়া কম হলে ছোট আকারের এবং বেশী হলে বড় আকারের পানি প্রবাহকে ব্যবহার করা যায়
* যেসব এলাকায় পানি সহজে পাওয়া যায় সেসব এলাকায় এ পদ্ধতি সুবিধাজনক
* সেচের পানি জমিতে প্রয়োগের জন্য জমি তৈরী খরচ কম

অসুবিধাসমূহ

* পানির অপচয় বেশী হয়
* বেলে দোআঁশ মাটিতে বেশী পানির অপচয় হয়
* জমিতে সেচের পানির বন্টন সমানভাবে হয় না
* জমিতে পানি প্রবেশের জায়গায় চুয়ানো পানির পরিমাণ অত্যাধিক এবং জমির শেষ প্রান্তে প্রায়ই অপর্যাপ্ত থাকে
* বড় আকারের জমিতে পানি প্রাপ্তির বেশী হেরফের হয়ে থাকে

আইল প্লাবন বা আইল থালাকরণ পদ্ধতি (Check flooding or check basin method)

দুই থেকে তিন শতাংশ ঢালুত্ব বিশিষ্ট জমিতে এ পদ্ধতি ব্যবহার সুবিধাজনক। উচ্চতা ও সমতার ভিত্তিতে আইল দিয়ে জমিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয় এবং নালা বা সাইফন এর মাধ্যমে প্রথমে উঁচু ভাগে এবং ক্রমান্বয়ে নিচু ভাগে পানি প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতিতে পানির অপচয় কম হয়। তবে যে সকল ফসলের মূলাঞ্চল বা ভূগর্ভস্থ অংশ অধিক আদ্রতা সহ্য করতে পারে না, সে সকল ফসলে এ পদ্ধতিতে সেচ দেয়া অসুবিধাজনক। মূলতঃ এটি মুক্ত প্লাবন পদ্ধতির একটি উন্নত সংস্করণ। তবে, আইল তৈরি করাতে এ পদ্ধতিতে অপচয় ও খরচ উভয়ই বেশি। সাধারণতঃ ধানের জমিতে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

থালা বা আংটি থালা পদ্ধতি (Basin or ring basin method)

অনেক জায়গা জুড়ে উৎপাদিত ফসলের প্রতিটি গাছকে ভিন্ন ভিন্নভাবে যত্ন করতে এ ধরণের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রতিটি গাছের গোড়ার চারদিকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত কিছু মাটি তুলে পানি জমা করার মতো অগভীর গর্ত তৈরি করা হয় বা নির্দিষ্ট দূরত্বে নালার আংটি বা রিং তৈরি করে পানি জমানোর ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে অগভীর নালা প্রতিটি গাছের থালার সাথে সংযোগ দেয়া হয়। প্রথমে উঁচু গাছের সেচ প্রদান করা হয় এবং সেই গাছের গোড়া ভিজিয়ে ক্রমান্বয়ে সেচের পানি গড়িয়ে নিচের গাছের থালাগুলোতে জমা হয়। এ পদ্ধতিতে পানির অপচয় হয় না এবং জমির সকল অংশ ভিজানোর প্রয়োজনও হয় না। এ ধরণের পদ্ধতিতে লাউ, কুমড়া ইত্যাদি সবজিসহ ফলের বাগানে ব্যবহার করা যায়।

ভূ-গর্ভস্থ পাইপ পদ্ধতি (Buried pipe method)

এই পদ্ধতিতে ভূ-গর্ভস্থ পাইপের মাধ্যমে পানি সেচ এলাকার বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হলেও রাইজার (Riser) এবং ভাল্ব-এর মাধ্যমে পানি মাটির উপরে এনে ছেড়ে দেয়া হয়। তাই এ পদ্ধতিটি ভূ-গর্ভস্থ সেচ পদ্ধতির অন্তর্গত। অন্যান্য পদ্ধতিতে সেচ নালা তৈরির জন্য যে জমির অপচয় হয়; এ পদ্ধতিতে তা হয় না। বর্তমানে বরেন্দ্র বহুমুখী প্রকল্প এবং বিএডিসি এই পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করছে।

ভূ-গর্ভস্থ পদ্ধতি (Subsurface method)

মূলাঞ্চলের নিম্নস্তরে ছিদ্রযুক্ত পাইপের মাধ্যমে এ পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতিতে মাটির গভীরে ১০-১২ সেমি দূরত্বে ৫-৭ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট ছিদ্রযুক্ত পাইপ ব্যবহার করা হয়। পাইপের ছিদ্র দিয়ে পানি মূলাঞ্চলের মাটিতে প্রবেশ করে। এ পদ্ধতির প্রাথমিক খরচ খুব বেশি হলেও ফসলের প্রয়োজন সাপেক্ষে পরিমিত সেচ প্রদান করা যায়। তাছাড়া, দু'মিটার গভীরের অভেদ্য শক্ত স্তর বিশিষ্ট বেলে দোঁআশ জমিতে এ পদ্ধতিতে সেচ প্রদান সুবিধাজনক। কারণ, এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে তা ক্ষার জমাকরণ (Alkali accumulation) ও জলাবদ্ধতা জনিত ক্ষতি হতে ফসলকে রক্ষা করে (Israelsen and Hansen, 1962)। এ পদ্ধতিতে শ্রমিক খাতে কোন খরচ হয় না বললেই চলে।

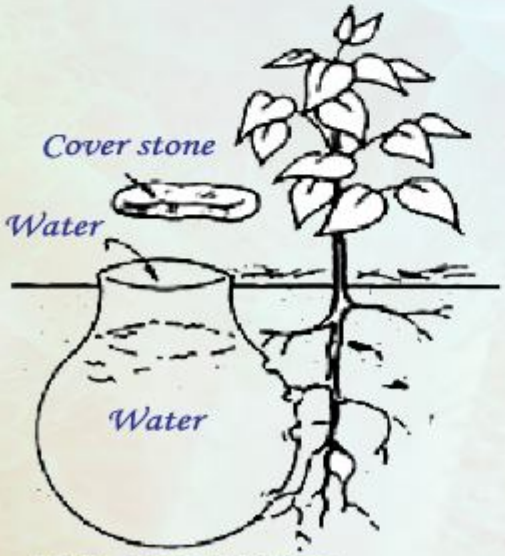

UNGLAZED CLAY POT

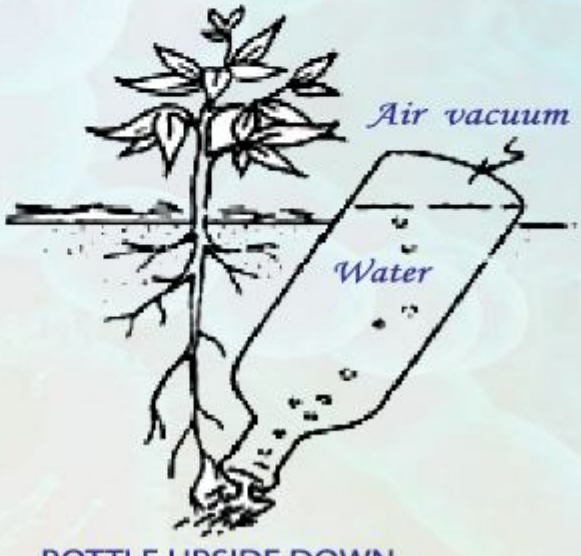

BOTTLE UPSIDE DOWN

বেগুনে গুরুত্বপূর্ণ সেচ পর্যায়সমূহ

* রোপণ এর সময়
* ফুল আসার সময়
* ফল বৃদ্ধি পর্যায়

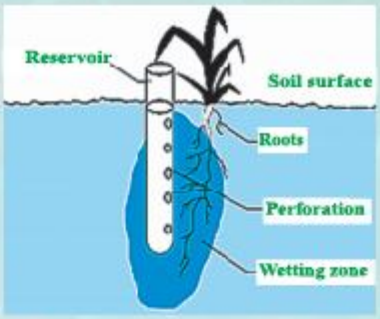

বেগুন গাছে সেচের পরিমান

* ১ একর জমিতে ২৬০০০ লিটার পানি সেচ প্রয়োজন।
* যদি ১ হেক্টর জমিতে ৪৫ টন বেগুন উৎপাদন হয়, তাহলে ১ কেজি বেগুন এ ৫৮ লিটার সেচ লাগে। গাছের যে সকল রোগ পানির দ্বারা বিস্তার ঘটে যেমন ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা বেগুনের ঢলে পড়া রোগ এর বিস্তার ঘটে, সে ক্ষেত্রে ফার্টিগেশন সেচ বা কলস সেচ পদ্ধতি বা বোতল সেচ পদ্ধতি সর্বাপেক্ষ উত্তম সেচ পদ্ধতি।

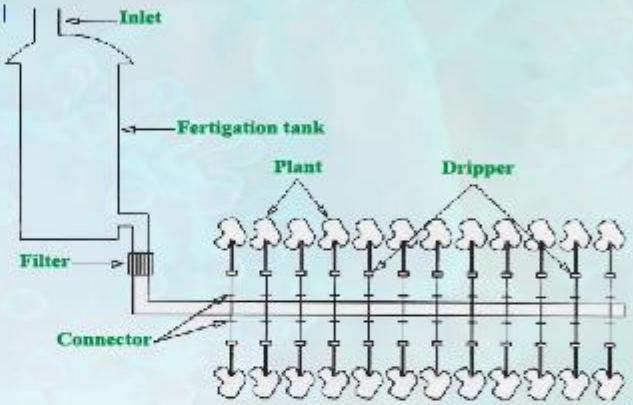

বেগুনে ফার্টিগেশন সেচ

* নাইট্রোজেন -১১০ কেজি/হেক্টর
* ফসফরাস-৩০কেজি/হেক্টর
* পটাশিয়াম-৬০ কেজি/হেক্টর
* ইউরিয়া ও এমপিও সাশ্রয়ী হয় ৩৫% ও ৫০%

বেগুনের পুষ্টিমান ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে বেগুন চাষের বর্তমান অবস্থা

ড. মো. খলিলুর রহমান ভূঁইয়া
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম-৪৩৩০

বেগুন বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় সবজি। আমাদের দেশে সারা বছর বেগুনের চাষ হলেও শীত মৌসুমে ফলন বেশি হয়ে থাকে। তাই বেগুনকে মূলত শীতকালীন সবজি বলা হয়। আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতের বেগুন পাওয়া যায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কর্তৃক স্থানীয় বিভিন্ন জাতের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে বাছাই প্রক্রিয়া, সংকরায়ন ও জিন কৌশল এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১৬ টি জাত উদ্ভাবন করেছে।

বেগুন নামক এই সবজিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন (এ) যা চোখের জন্য খুবই উপকারী। এই ডিজিটাল যুগে আমাদেরকে চোখের পরিশ্রম করতে হয় খুব বেশি। এতে চোখের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বেগুন আমাদের চোখ ও ত্বকের জন্য বয়ে আনবে সুফল। এই সবজিতে কোলেস্টেরল বা চর্বি নেই। কোলেস্টেরল হলো চর্বি জাতীয় উপাদান যা রক্তে জমা হয়। যাদের রক্তে কোলেস্টেরল বেশি তারা কোন রকম দুশ্চিন্তা ছাড়াই খেতে পারেন বেগুন। এটি পাকস্থলি, কোলন, ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদান্ত্রের (এগুলো পেটের ভেতরের অঙ্গ) ক্যানসারকে প্রতিরোধ করে। যেকোন ক্ষতস্থান শুকাতে সাহায্য করে বেগুন। বেগুনে আয়রন রয়েছে যা রক্ত বাড়াতে সাহায্য করে। রক্ত শুন্যতার রোগীরাও খেতে পারেন এই সবজি। এতে চিনির পরিমাণ খুবই সামান্য। তাই ডায়াবেটিস এর রোগী, হৃদরোগী ও অধিক ওজন সম্পন্ন ব্যক্তিরা নিঃসংকোচে খেতে পারেন বেগুন। বেগুনে রয়েছে রিবোফ্ল্যাবিন নামক উপাদান। এই উপাদান জ্বর হওয়ার পরে মুখ ও ঠোটের কোনের ঘা, জিহ্বার ঘা প্রতিরোধ করে; দূর করে জ্বর জ্বর ভাব। বেগুন ভিটামিন এ,সি,ই এবং কে সমৃদ্ধ সবজি। ভিটামিন এ চোখের পুষ্টি যোগায়। চোখের যাবতীয় রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর ভিটামিন সি ত্বক, চুল, নখকে করে মজবুত। দেহে রক্ত জমাট বাধার বিরুদ্ধে কাজ করে ভিটামিন ই, ও কে। এই চারাটি ভিটামিন শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে করে বহুগুনে কার্যকর। প্রচুর পরিমাণে ডায়াটারী ফাইবার বা আঁশ রয়েছে এই সবজিতে যা খাবার হজমে সাহায্য করে। কোষ্টকাঠিন্য দুর করতে এর ভুমিকা অনেক। ডায়াটারী ফাইবার জাতীয় সবজি (আঁশ-জাতীয় উপাদান) ডায়াবেটিস এর রোগীদের জন্য খুব উপকারী। বেগুনে রয়েছে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম। এই উপাদান গুলো দাঁত, হাড় ও নখ শক্ত করে। দাঁতের মাড়িকে করে শক্তিশালী। ভঙ্গুরতা রোধ করে নখের। এলার্জির সমস্যা থাকলে বেগুন পরিহার করা উচিত। বেগুন অনেকের এলার্জি বাড়িয়ে দেয়। জিংক এর ঘাটতি পূরণ করার জন্য ডায়রিয়া চলাকালে বেগুন খাওয়া অনুচিত। ডায়রিয়া ভাল হয়ে যাওয়ার পরে বেগুন খাওয়া উচিত। ডায়রিয়া হওয়ার পর দেহে জিংক এর ঘাটতি হয় যা পূরণ করে বেগুন।

জিংক এর ঘাটতি মূলত বেশি হয় শিশুদের। শিশুরা সবজি খেতে পছন্দ করে না। তাদেরকে খিচুড়ির সঙ্গে বেগুন মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। এতে শিশুদের শরীরে জিংক এর ঘাটতি পূরন হবে। যারা এলার্জির জন্য ওষুধ খাচ্ছেন তাদের চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া বেগুন না খাওয়াই ভাল।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে বেগুন চাষের বর্তমান অবস্থা

বেগুন হচ্ছে এমন একটি সবজি যা বাংলাদেশের সকল অঞ্চলেই সমান ভাবে চাষাবাদ করা সম্ভব। সারা দেশে মোট আবাদী সবজি জমির মধ্যে ১২.০৩% জমিতে এই বেগুনের চাষাবাদ হয়। বিবিএস ২০২০ এর তথ্য মতে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে শুধু রবি মৌসুমে এর ফলন ৩৬০ হাজার মেট্রিক টন এবং খরিফ মৌসুমে ১৭০ হাজার মেট্রিক টন উৎপাদন হয়েছে। মোট আবাদী বেগুনের জমির ১.৪% জমিতে বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলে বেগুনের চাষাবাদ হয়। চট্টগ্রাম এর আবহাওয়া ও জলবায়ু বেগুন চাষাবাদের জন্য খুবই উপযোগী। তবে বেগুন চাষাবাদে ফল ও ডগা ছিদ্রকারী পোকা (Furit and Shoot borer) একটি মারাত্মক ক্ষতিকর পোকা যা দ্বারা বেগুন ক্ষেত বার বার আক্রান্ত হয়। এই পোকার আক্রমণ থেকে ফসল বাঁচাতে কৃষকেরা প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর এবং বিপদজনক কীটনাশক ব্যবহার করে থাকেন যা স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এই পোকার আক্রমণ থেকে পরিত্রানের জন্য কৃষকেরা প্রতিদিন সকাল বিকাল কীটনাশক স্প্রে করে থাকেন।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা অবলম্বন করে চট্টগ্রাম অঞ্চলের চাষিরা বেগুন চাষাবাদে অনেক সুফল পাচ্ছেন। বাংলাদেশে জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক বেগুনের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং কৃষকদের চাষের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বেগুনের এই জাত সমুহে জিনগতভাবে পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি বৈশিষ্ট্য যোগ করা হয়েছে যা বেগুনের ক্ষতিকর ফল ও ডগা ছিদ্রকারী পোকার বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক ভাবে কার্যকরী সুরক্ষা দিতে সক্ষম। এর ফলে বেগুন চাষাবাদে কীটনাশক ব্যবহারের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে কমে গিয়েছে যা কৃষক তথা জনসাধারনের জন্য আশির্বাদ স্বরুপ। তাছাড়া আরো একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা হচ্ছে বেগুনের ঢলে পড়া রোগ এর আক্রমন। প্রতি বছরই এই রোগটি বেগুন চাষাবাদের জন্য একটি বড় বাধার সৃষ্টি করে থাকে। বিশেষ করে চট্টগ্রাম অঞ্চলের জন্য ঢলে পড়া রোগটি বেগুন চাষাবাদের একটি প্রধান অন্তরায়। যদিও বেগুন চাষাবাদের জন্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বিশেষ ভুমিকা পালন করে থাকে। রবি মৌসুমে আশানুরুপ ফলন পাওয়া গেলেও খরিফ মৌসুমে দেখা যায় এ অবস্থার ভিন্ন চিত্র। এ মৌসুমে বৃষ্টি ও খরার প্রভাবে বেগুনের ঢলে পড়া রোগের আক্রমণ অনেকাংশে বেড়ে যায়; যার ফলশ্রুতিতে এই মৌসুমে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বেগুন চাষাবাদ কৃষকের জন্য একটি অপরিহার্য চ্যালেঞ্জ। এই অবস্থার থেকে উত্তরণের জন্য আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম এর বিজ্ঞানীগণ নিরলস ভাবে কাজ করছেন যাতে করে চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের সকল চাষিরাই এর সুফল ভোগ করতে পারেন। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে আন্তঃকোষীয় উপকারী নভেল বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া থেকে উৎপাদিত জৈব পণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে বেগুনের ঢলে পড়া রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার কর্মসুচির আওতায় কাজ শুরু করা হয় (২০১৯-২০২১) এবং যা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষামূলক ভাবে করা হয়েছিল। গত বছর (২০২০ ইং) বেশ কিছু কৃষকের মাঠে পরীক্ষণ পরিচালনার পর দেখা গেছে; সেখানে গবেষণার সাফল্য চোখে পড়ার মত, প্রায় ৮৩% পর্যন্ত উইল্টিং রোধ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। যার ধারাবাহিকতায় চলতি বছরেও (২০২১ ইং) চট্টগ্রাম তথা পাবর্ত্য চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও কক্সবাজার এলাকায় মোট ১৬ টি ভিন্ন ভিন্ন প্লটে পরীক্ষণ চলমান রয়েছে। উইল্টিং হওয়ার জন্য মুলত এক প্রকার অপকারী ব্যাক্টেরিয়া দ্বায়ী। আমরা জানি, গাছ সাধারণত শিকড়ের সাহায্যে জাইলেম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাটি হতে পানি তথা খাদ্যোপাদান গ্রহণ করে থাকে। অপকারী ব্যাক্টেরিয়াসমুহ এই জাইলেম প্রক্রিয়ার পথ বন্ধ করে দেয় যার ফলে গাছ আর শিকড়ের সাহায্যে খাদ্যোপাদান গ্রহণ করতে পারে না। একটা পর্যায়ে গাছগুলো ঢলে পড়ে মারা যায়। এই অবস্থার বিপরীতে উপকারী নভেল বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া জাইলেম নালীসমুহকে পরিস্কার করে দেয় এবং ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা এই জাইলেম প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটাতে বাধার সৃষ্টি করে। যার ফলশ্রুতিতে গাছটি উইল্টিং এর হাত হতে রক্ষা পায়। আমাদের ল্যাবরেটরিতে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত এই ব্যাক্টেরিয়ার সেলসমূহ কালচার করে তৈরী করা হয় লিকুইড (তরলজাতীয়); অতপর এই লিকুইড বিভিন্ন উপাদানের সহিত মিশ্রিত করে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করে অপকারী ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে গড়ে তোলা হচ্ছে একটি প্রতিরোধী দেয়াল। উপকারী নভেল বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা উৎপাদিত জৈব পণ্য ব্যবহার করে বেগুনের ঢলে পড়া রোগ নিয়ন্ত্রণে যথাযথ সাফল্য অর্জণ সম্ভব হলে শুধু চট্টগ্রাম অঞ্চলের চাষীরাই নয়, সারা বাংলাদেশের জনগন উপকৃত হবে। সেই সাথে উৎপাদিত হবে লাখ লাখ টন বিষমুক্ত নিরাপদ সবজী।

এ ছাড়াও চট্টগ্রামের মানুষ দেশীয় বেগুন (Local bringal) খেতে পছন্দ করেন; বিশেষ করে পোতা বেগুন। এ অঞ্চল পোতা বেগুনের resourceful অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। পোতা বেগুনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলো ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী। তাই এই জাতটি উদ্ভাবনের নিমিত্ত অঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, হাটহাজারী বেশ কিছু জার্মপ্লাজম সংগ্রহের মাধ্যমে প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছে। আশা করি, আগামী ২/৩ বছরের মধে বেগুনের ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী জাত অত্র কেন্দ্র হতে মুক্তায়ন করা যাবে। ফলশ্রুতিতে ঢলে পড়া রোগ দমন করা যাবে। সুতরাং ভালো জাত এবং বেসিলাসের সঠিক মাত্রার সমন্বয় হলে সোলানেসি গোত্রের সবজি সমূহের ঢলে পড়া রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

বেগুনের পুষ্টি ও ঔষধি গুণাগুন

মো. মনিরুজ্জামান
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
কৃষি গবেষণা কেন্দ্র
পাহাড়তলী, খুলশী, চট্টগ্রাম

বেগুন বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় সবজি এবং সারা বছর পাওয়া যায়। অধিকাংশ বেগুন বাংলাদেশের সকল স্থানে এবং প্রত্যেক বসত বাড়ির সবজি বাগানে উৎপাদিত হয়। ইহা স্বল্প সম্পদশালী (Resource-constrained) কৃষকদের পুষ্টি ও নগদ অর্থ উপার্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বাংলাদেশের বেগুনে প্রচুর ভিন্নতা রয়েছে - আকার, আকৃতি, রং ও স্বাদে। পুষ্টি গুণে বেগুন অনন্য এবং প্রতি ১০০ গ্রাম কাঁচা (Raw) বেগুনে ২৫ ক্যালরী শক্তি যোগান দেয় এবং ইহা বাস্তবিক পক্ষে চর্বিবিহীন। বেগুনে ৯২.৭ % পানি থাকে, ইহা ছাড়াও আঁশ (fiber), ফলিক এসিড, ম্যাংগানিজ, থায়ামিন, ভিটামিন বি-ডি ম্যাগনেশিয়াম এবং পটাশিয়াম বিদ্যমান। বেগুনে প্রচুর পরিমাণে এন্টিঅক্সিডেন্ট ও ফাইটোকেমিকেল রয়েছে।
নিম্নলিখিত টেবিলটি ১ কাপ বা প্রায় ৯৬ গ্রাম রান্না করা বেগুনে পুষ্টি উপাদান ও একজন ব্যক্তির প্রতিদিনের পুষ্টি চাহিদা দেখানো হল ঃ

পুষ্টি উপাদান	১ কাপ বা প্রায় ৯৬ গ্রাম রান্না করা বেগুনে পুষ্টি উপাদান	একজন ব্যক্তির প্রতিদিনের পুষ্টি চাহিদা
শক্তি /ক্যালরী (গ্রাম)	৩৩.৬	১০০০-৩০০০
শর্করা (কার্বোহাইড্রেড) গ্রাম	৮.২৯	১৩০
আঁশ (fiber) (গ্রাম)	২.৪	২২.৪-৩৩.৬
ম্যাগনেশিয়াম (মিলি গ্রাম)	১০.৬	৩১০-৪২০
ফসফরাস (মিলি গ্রাম)	১৪.৪	৭০০-১২৫০
পটাশিয়াম (মিলি গ্রাম)	১১৭	৪৭০০
ফলিক এসিড (মিলি গ্রাম)	১৩.৪	৪০০
বিটা ক্যারোটিন (মিলি গ্রাম)	২১.১	-

বেগুনে প্রচুর পরিমাণ ঔষধি গুণাগুন রয়েছে যা নিম্নে আলোকপাত করা হল

Control High Blood Pressure and Cholesterol

বেগুনে প্রচুর ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাস এবং ক্যালশিয়াম থাকে। এই সমস্ত খনিজগুলি দেহের ইলেক্ট্রোলাইট ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। এটি শরীরের উপর সোডিয়ামের প্রভাবগুলি নিরপেক্ষ করতে সহায়তা করে যার ফলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। এ ছাড়া বেগুনে যথেষ্ট পরিমাণে অ্যান্টোকায়ানিনস থাকে যা আপনার রক্তচাপকে হ্রাস করে। এটিতে ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড রয়েছে যা শক্তিশালী এন্টিঅক্সিডেন্ট এজেন্ট হিসেবে কাজ করে দেহে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে দেয়। বেগুনে উচ্চ পরিমাণ ফাইবারও রয়েছে যা পিত্ত উৎপাদন করার জন্য যকৃতের দ্বারা রক্তের কোলেস্টেরলের শোষণকে বাড়িয়ে তোলে। ফলে কোলেস্টেরল কমে যায়।

Diabetic

বেগুনের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (GI) হল ১৫। যার কারণে হজমকে সহজতর করে। যেহেতু বেগুনে শর্করা কম এবং ফাইবারের পরিমাণ বেশী তাই এগুলি ডাইবেটিসে আক্রান্তদের পক্ষে ভাল বলে চিহ্নিত হয়। কারণ এটি (উচ্চ ফাইবার) খাদ্য থেকে গ্লুকোজ শোষণকে নিয়ন্ত্রণ করে শরীরে রক্তে শর্করার মাত্রা কমিয়ে দিতে সহায়তা করে।

Annemia

আয়রনের ঘাটতি সামগ্রিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং এটি রক্তস্বল্পতায় প্রকাশ পেতে পারে। রক্তস্বল্পতা মাথাব্যাথা এবং মাইগ্রেন, দুর্বলতা, হতাশা, অবসন্নতা এবং জ্ঞানীয় সমস্যা দ্বারা বর্ণিত হয়। আয়রনের উচ্চ মাত্রায় খাবার গ্রহণ রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে এবং বেগুনে ভোজ্য ফলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আয়রন ধারণ করে। একইভাবে বেগুনগুলি লোহার মতোই লোহিত রক্তকণিকার একটি অপরিহার্য উপাদান। এই দুটি খনিজ ছাড়া শরীরে লাল রক্ত কোষের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। শিরাগুলির মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্যকর, লোহিত রক্তকণিকা প্রবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আপনি শক্তি এবং শক্তিতে লক্ষণীয় বর্ধন দেখা যাবে। ফলশ্রুতিতে স্ট্রেসের (Stress) অনুভূতিগুলি বর্জন হবে।

Cognitive Function

প্রাণীজ গবেষণার অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, বেগুনের ত্বকের অ্যান্থোসায়নিন ইনসুলিন মস্তিষ্কের কোষের ঝিল্লিগুলিকে ফ্রি র‍্যাডিক্যাল দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে। ইনসুনিন পুষ্টিগুলি কোষে পরিবহন এবং বর্জ্য স্থানান্তরিত করতে সহায়তা করে। অ্যান্থোসায়ানিন নিউরো ইনফ্লেমেশন প্রতিরোধে এবং মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহকে সহায়তা করতেও সাহায্য করে। এটি স্মৃতি-শক্তি হ্রাস (বয়স-সম্পর্কিত মানসিক অবক্ষয়ের অন্যান্য দিকগুলি) রোধ করতে সহায়তা করতে পারে

Weight Loss

বেগুনে উচ্চ ফাইবার ও কম ক্যালরি থাকার কারণে শরীরে অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

Cancer

বেগুনের পলিফেনলগুলি শরীরকে ক্যান্সার থেকে রক্ষা করতে পারে। অ্যান্থোসায়ানিনস এবং ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড কোষগুলিকে ফ্রি র‍্যাডিকালগুলির দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। দীর্ঘমেয়াদে এটি টিউমার বৃদ্ধি এবং ক্যান্সার কোষের বিস্তার রোধ করতে সহায়তা করতে পারে।

অ্যান্থোসায়ানিনগুলি টিউমার গঠনে প্রতিরোধ করে, প্রদাহ হ্রাস করতে এবং ক্যান্সার কোষগুলিকে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম এমন এনজাইমগুলি ব্লক করে দিতে সহায়তা করে। ফলে বেগুনের প্রভাবে ক্যান্সার অনেকংশে রোধ পায়।

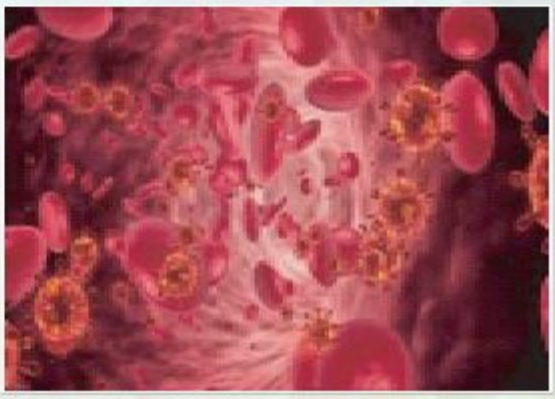

আমরা বেসিলাস পরিবার

ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি এবং ড. মো. নাজিরুল ইসলাম, মহাপরিচালক, বিএআরআই মহোদয় বক্তব্য রাখছেন (১৭ আগাষ্ট ২০২০)।

ড. মো. কামরুল হাসান, পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) বিএআরআই মহোদয় বক্তব্য রাখছেন (২০ মার্চ ২০২১)।

মাঠ দিবস ২০২১, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

ড. মো. মিয়ারুদ্দীন, পরিচালক (গবেষণা), বিএআরআই মহোদয় বক্তব্য রাখছেন (২০ নভেম্বর ২০২০)।

মাঠ দিবস ২০২১, ময়ূরখীল, খাগরাছড়ী, পার্বত্য জেলা।

Control
EMOs